

বিনয় বাদল দীনেশ





বিষয় বাংলা ও সাহিত্য

এরা তিন জন ঐতিহাসিক

শ্রীমতী অমিতা দেবী

বিনয়
বাদল
দীনেশ

কল্পনা সাহিত্য মন্দির
কলিকাতা-৯

প্রকাশক ঃ
শ্রীহরেন্দ্রনাথ রায়
১৮, রজনী গুপ্ত রো,
কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীজিতেন্দ্র নাথ বসু
দি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া
৩।১ মোহন বাগান লেন,
কলিকাতা-২

মূল্য ঃ
চার টাকা

উনিশ শ' তিরিশের আটই ডিসেম্বর।

পথ চলছিল ওরা।

ওরা তিন জন।

ওরা মুক্তি সৈনিক দল।

লক্ষ্য ওদের পূর্ব নির্দ্ধারিত।

সবার একই লক্ষ্য—লক্ষ্য মুক্তির।

চোখে মুখে লক্ষ্যে পৌছাবার, ব্রত উদ্‌যাপনের একটা শপথ। মুখের প্রতিটি রেখায় সেই শপথ পালনেরই প্রতিশ্রুতির আলো ঝল্‌মল ঔজ্জ্বল্যতা।

ব্রত ওদের মহান। ওরা যে পরাধীন দেশের পরাধীন নাগরিক। ব্রিটিশ শাসনের অত্যাচারে, নিষ্পেষণে, নারী নির্যাতনে স্তব্ধ ওরা। কিন্তু এখন পড়ে পড়ে শুধু মার খেতে রাজী নয় ওরা। এক তরফা নির্যাতন আর অত্যাচার কত সওয়া যায়? মুখ বুজে সহ্য কোরবারও তো একটা সীমা আছে! সম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের শাসন ও শোষণ, অত্যাচার আর নির্যাতন এখন ষোল কলায় পূর্ণ হয়েছে। পাপ কানায়।

এবার বাদলা নেওয়ার পালা।

হ্যাঁ' বদলা ওরা নেবেই! সেই শপথই ওদের চোখে মুখে সর্ব অবয়বে। মার তারা খেয়েছে এতদিন, এবার পাল্টা মারবার দিন।

সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের সবচেয়ে শক্তিশালী ঘাঁটিটাই ওরা আক্রমণ করবে।

রাইটার্স বিল্ডিং।

ব্রিটিশ শাসকের অহঙ্কার আর দম্ভের ধ্বজাটা ওর মাথার উপরে আর বেশীদিন পত্ পত্ করে উড়বে না। ব্রিটিশ ইউনিয়ন জ্যাক ধূলোয় গড়াগড়ি যাবে।

ওরা যেন মানস চক্ষে দেখতে পাচ্ছে সেই দিনটি সমাগত। সেই দিনের আর বেশী দেরী নেই। কী গভীর বিশ্বাস। কী গভীর আত্ম-প্রত্যয় !

ভয় কাকে বলে ওরা জানে না।

ভয় পেলে ওদের চলবেও না। ওরা যে মাতৃমুক্তি পণ নিয়েছে। পরাধীন দেশ মাতৃকাকে মুক্তি ওদের দিতেই হ'বে। জাতির মুক্তিত্রাতা হয়তো ওরা নয়, কিন্তু মুক্তির পথটাকে তো খানিকটা প্রশস্ত করে দিতে পারে! বলি দেবে ওরা লাল মুখে সাহেব-গুলোকে দেশ মাতৃকার পায়ে।

না, ক্ষমা নেই। ক্ষমা করা ওদের চলে না।

ওরা একবার মনে মনে ভেবে নেয় রাইটার্স বিল্ডিং-এর কোন বিভাগ কোথায়? নিখুঁত ম্যাপটার উপর একবার মনে মনে চোখ বুলিয়ে নেয়। ঐ তো ইন্সপেক্টর জেনারেল লেফ্টেন্যাণ্ট কর্ণেল সিম্পসনের ঘর; এই তো হোম সেক্রেটারীর অফিস, ওখানেই যে বসে রয়েছেন আলবিয়ান মার; মিঃ ক্রেগ, মিঃ ফোর্ড, মিঃ জোনস সবাইতো ঐ ঘরেই, এই তা পাসপোর্ট অফিস, ঐ তো জুডি-সিয়াল সেক্রেটারী মিঃ নেলশ্ন, সেক্রেটারী মিঃ ট্যয় নামও ওখানে।

মাতৃ পূজার সবগুলো বলি একই স্থানে।

কী আনন্দ। কী আনন্দ!

আনন্দের ছোঁয়াচ বোধ হয় তখন ওদের চোখে মুখেও।

মেজর, ক্যাপটেন আর লেফটেন্যাণ্ট।

বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স'এর অভিজ্ঞ বিচারকেরাই তাদের এ সম্মানে ভূষিত করেছিলেন।

আর বেশী দূর নয়।

পৌঁছে গেছে ওরা রাইটার্স বিল্ডিংএর করি-ডোরে।

মনে মনে ওরা আওড়ে নেয় 'বন্দেমাতরম্'

বীজ মন্ত্র!

বিপদ, বাধা-বিঘ্ন কাটিয়ে ওঠার প্রচণ্ড শক্তি ধরে এ মন্ত্র।

এবার ওদের প্রস্তুতির পালা। এবার ওদের অ্যাকশন্ নেওয়ার পালা।

পোশাকের পাসপোর্টে ওরা প্রহরীদের ছাড়পত্র পেয়েছে। সিঁড়ির ধাপে ধাপে মেপে মেপে পা ফেলে ফেলে ওরা একতলা হ'তে দোতলায় উঠে এসেছে। পৌঁছে গেছে দোতলার বারান্দায়।

পরাধীন দেশমাতৃকার অশ্রু-ছলছল চোখ দুটি ওদের মানস পটে ভেসে উঠেছে।

কানে পৌঁছেছে অত্যাচারিত, উৎপীড়িত নারী পুরুষের করুণ চোঁখে মুখে ওদের একটা প্রতিহিংসার দাবানল।

হিংসা দিয়েই ওরা হিংসার জবাব দেবে।

ওরা যে মায়ের কাছে শপথ করে এসেছে: তোমার অশ্রু মোছাবই, মা।

মায়ের যোগ্য সন্তান ওরা। সুসন্তান! সন্তান হয়ে মায়ের দুঃখ দৈন্য আর কত সওয়া যায়?

ওরা বিনয়-বাদল দীনেশ।

মেজর বিনয়।

বিনয় বোস।

ঢাকা মিটফোর্ড মেডিক্যাল স্কুলের ফোর্থ ইয়ারের ছাত্র বিনয় বোস। ভাল ছাত্র, নাম করা টেনিস খেলোয়ার।

বিক্রম পুরের রাউথ ভোগে ওদের বাড়ি। বাবা রেবতীমোহন বোস। মস্ত নাম করা শিকারী। তিনি থাকেন জামসেদপুরে। শোনা গেছে রেবতীবাবুর বন্দুকের গুলি কখনও লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয় না।

আরমানি টোলার পিকচার হাউসের সামনের মেডিক্যাল মেসে থেকেই বিনয় পড়াশোনা করেন। উজ্বল, প্রাণবন্ত, সুগঠিত দেহী যুবক বিনয় অনিন্দ্য সুন্দর মনের অধিকারী ছিলেন। কলেজ পাঠ্য পুস্তক আর টেনিস মাঠেই কিন্তু তিনি তাঁর সব উদ্যম, সব প্রচেষ্টা নিঃশেষ করে দেন নি। তাই মেটেরিয়া মেডিকার পাশাপাশি আর একখানা বইও তিনি পড়তেন। সে-খানা ভারতের ইতিহাস।

১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন।

বাঙালার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরাজিত হলেন বৃটিশ সৈন্যের কাছে। পলাশী প্রান্তরে শেষ স্বাধীন রবি অস্ত গেল। পলাশীর ভাগ্যকাশেই যে শুধুমাত্র দুর্যোগের ঘনঘটা দেখা গেল তা তো নয়। সেই ক্ষুদ্র তুচ্ছ মেঘখানাই তো ক্রমান্বয়ে সারা বাংলা—সারা ভারতের বুকে ছড়িয়ে মসী লিপ্ত করে দিল।

রচিত হল-কলঙ্কের ইতিহাস।

সেনাপতি মীরজাফর, রাজা রাজবল্লভ, ধনকুবের জগৎ শেঠ—এঁরাই সেদিন সিরাজের বিরোধিতা করে ডেকে আনলেন গোবিন্দপুর, সুতানটির লালমুখো বেনিয়াগুলোকে—ওদের লোভ দেখানো হল। প্রচুর অর্থ দেওয়া হ'বে। বিনিময়ে সিরাজের বদলে মীরজাফরকে সিংহাসনে বসাতে হ'বে।

তাই হয়েছিল। কিন্তু ধোপে তা টিকল না। মীরজাফর গেল, মীরকাসেম এল, আবার মীরজাফর।

বাংলা দেশ তখন নবাবীর ভাঙাগড়া চলছিল। এই সময়েই ক্লাইভ এলেন বাংলার গভর্ণর হয়ে। দিল্লীর বাদশাহ্ দ্বিতীয় শাহ্ আলমের কাছ থেকে পেলেন ফরমান। এই ফারমান অনুসারে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী বা রাজস্ব আদায় করার অধিকার লাভ করলেন। বণিক কোম্পানীর মানদণ্ড দ্বিতীয় শাহ্ আলমের দাক্ষিণ্যে রাজ দণ্ডে রূপান্তরিত হল।

ক্লাইভের স্থাপিত এই ভিত্তি ওয়ারেন হেষ্টিংস করলেন সুদৃঢ় দেশীয় রাজন্যবর্গ হেষ্টিংসের সঙ্গে পেরে উঠলেন না। আর জাত

সাম্রাজবাদী ওয়েলেসলি ছলে বলে কৌশলে দেশীয় রাজ্যগুলি অধিকার করে নিলেন। তাঁর অধীনতা মূলক মিত্রতা নীতির উদ্দেশ্য ছিল অরাজক, দুর্বল দেশীয় রাজ্যগুলিকে সামরিক সাহায্য দিয়ে ইংরেজদের অধীনে নিয়ে আসা—আর তারপর তাদের দিয়েই প্রতিবেশী শক্তিশালী দেশগুলির উপর আঘাত হানা। ফলে হায়দারাবাদ, অযোধ্যা, তাঞ্জোর, সুরাট, কর্ণাট—এগুলো ইংরেজ শক্তির কুক্ষিগত হয়ে পড়ল। লর্ড ডালহৌসী স্বত্ব বিলোপ নীতির জোরে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন। সাঁতারা, সম্বলপুর, ঝাঁসি, নাগপুর ইংরেজদের অধিকারে এল। ধীরে ধীরে ভারতে ব্রিটিশসাম্রাজ্য বিস্তার লাভ কোরল।

"জানি তার পথ দিয়ে বয়ে যাবে কাল,
কোথায় ভাসায়ে দেবে সাম্রাজ্যের দেশ বেড়াজাল।"

কবির এ বাণী মিথ্যে হয় নি। কিন্তু সে তো অনেক পরের কথা।

আঠার শতকের মধ্যভাগ হ'তে উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত আমরা ভারতবাসীরা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মনৈতিক কারণে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাবের প্রকাশ ঘটিয়েছিলাম। লর্ড ক্যানিং তখন ভারতের গভর্ণর জেনারেল হয়ে এসেছেন। তার শাসন ভার গ্রহণ করার এক বছরের মধ্যে সিপাহীরা হয়ে উঠল। সেটা আঠারো শ' সাতান্ন সালের কথা।

স্বাধীনতা আমরা পেলাম না। কিন্তু ভারতে কোম্পানীর কর্তৃত্বের অবসান হল। ভারত শাসন ভার গ্রহণ করল ইংলণ্ডেশ্বরী। ওরা অবশ্য সেদিন প্রতিশ্রুতি দিল: ভারতবাসীর ধর্ম-বিশ্বাস সামাজিক

রীতিনীতি, প্রাচীন আচার ব্যবহার— এগুলোর উপর হস্তক্ষেপ করবে না। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণায় আমরাও সাময়িক ভাবে ভুলে গেলাম নিজেদের অস্তিত্ব— ভারত শাসন আইন বিধিবদ্ধ হল যে!

উনিশ কুড়ি বছর কেটে যেতেই আমাদের মোহ টুটল, ঘুম ভাঙল। ভারতের প্রগতিপন্থী সম্প্রদায় শাসনতন্ত্রে অংশ গ্রহণের দাবী জানালেন। এ উদ্দেশ্য নিয়েই ল্যাণ্ড হোল্ডার্স সোসাইটি, বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন, ইণ্ডিয়া লীগ প্রভৃতি গঠন করা হয়েছিল।

রাষ্ট্র গুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দ মোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন বা ভারত সভা নামে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করলেন।

ইংরেজ কর্তৃপক্ষের টনক নড়ল। ওরা বুঝতে পারলেন, রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের আশায় জাতীয় আন্দোলন উত্তরোত্তর যে ভাবে ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং শক্তিশালী হয়ে উঠছে তাতে রাষ্ট্র বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী। ইংরেজ সেদিন ভয় পেয়েছিল, আশঙ্কা প্রকাশ করেছিল। সুতরাং ওরা চাইল, আন্দোলন একটি নিয়ম তান্ত্রিক ধারায় প্রবাহিত হোক। তার জন্য তাদের চেষ্টারও কোন কসুর রইল না।

তখন ভারতের গভর্ণর জেনারেল লর্ড ডাফরিন। তিনি বড্ড সেয়ানা। তাই ভারতবাসীর মতামত জানবার জন্য বিশেষতঃ রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস নামে একটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে সম্মতি দিলেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে বাঙালী ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন শুরু হল। কিন্তু বছরে মাত্র একবার। তবু দেশের নেতারা, হিন্দু মুসলমান

উভয় সম্প্রদায়েরই মুখপাত্র হয়ে দেশের নানা অভাব অভিযোগ আলোচনা করতেন, আবেদন জানাতেন ব্রিটিশ সরকারের কাছে এর সুরাহার জন্য।

কিন্তু অনুমতি ইংরেজ সরকার দিলে কি হয়। আসলে এ রকম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বা সেই প্রতিষ্ঠানের কোন আন্দোলনকে ওরা প্রীতির চোখে দেখল না। দেশীয় জনমত রুদ্ধ করতে হবে সুতরাং আরোপ কর 'রাজদ্রোহ আইন'। দেশীয় জন-মত সংবাদ পত্রের মারফতে দ্রুত প্রসার লাভ করছে সুতরাং চালু কর 'সংবাদ পত্র আইন'।

প্রতিক্রিয়া যে দেখা দিল না এর জন্য তা নয়। এক শ্রেণীর নেতারা অন্ততঃ বুঝতে পারলেন, আবেদন নিবেদনের নীতির পথ বেয়ে তাঁরা তাঁদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবেন না। এগুলো নিছক প্রহসন মাত্র। সুতরাং তাঁরা চরম পন্থী হয়ে উঠলেন। তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য হল ভারত থেকে ইংরেজ সরকারের উচ্ছেদ সাধন।

সাড়া দিল সবচেয়ে বেশী তরুণ সম্প্রদায়। ওরাই ব্রিটিশ বিদ্বেষী হয়ে উঠল। সমধিক স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা ওদের মধ্যে তখন তীব্র রূপ ধারণ করেছে। উনিশ শতকের শেষ ভাগে শুরু হল সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন।

গুপ্ত সমিতি স্থাপিত হল, শক্তিচর্চা, অস্ত্র সংগ্রহ আর ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতির পর্ব চলতে লাগল পুরোদমে। বাংলা আর মহারাষ্ট্র হল এই আন্দোলনের কেন্দ্র।

বাংলার বিপিনচন্দ্র পাল, মহারাষ্ট্রের বালগঙ্গাধর তিলক, পাঞ্জাবের লালা লাজপৎ রায় —এঁরা চাইলেন না ইংরেজদের সঙ্গে কোন আপোষে আসতে। তাঁরা চরম-পন্থী হয়েই রইলেন।

বাংলার চরম-পন্থী বা সন্ত্রাসবাদীর দল তখন বেশ শক্তিশালী

বিপ্লবকে তখন নেতৃত্ব দিলেন ঋষি অরবিন্দ ও তাঁর ভাই বারীন্দ্র কুমার ঘোষ।

লর্ড কার্জনের চোখে পড়েছিল এই সন্ত্রাসবাদী দলের কার্যকলাপ। তিনি দেখলেন বাংলা দেশ এই দলের প্রধান ঘাঁটি। সুতরাং শাসন কার্যের অসুবিধার অজুহাত দেখিয়ে বঙ্গ ভঙ্গের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন উনিশ শ' পাঁচ খৃষ্টাব্দে।

এতদিন পর্যন্ত একজন লেফাটেনান্ট গভর্ণর বাংলা বিহার উড়িষ্যার শাসন কার্য্য পরিচালনা করছিলেন। কিন্তু লর্ড কার্জন বাংলাকে দুর্বল করার জন্য বাংলা বিহার উড়িষ্যার মধ্যে বিভেদ আনলেন। পূর্ববঙ্গ ও আসাম নিয়ে একটি প্রদেশ হল আর একটি ভিন্ন প্রদেশ গঠন করা হল পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যাকে নিয়ে। সুরেন্দ্রনাথ বিপিনচন্দ্র, অরবিন্দ, অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রমুখ বাংলা মায়ের সুসন্তানেরা রুখে দাঁড়ালেন। ওঁরা এই বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের স্বপক্ষে জনমত গঠন করলেন। কবি, সাহিত্যিক—ওঁরাও বাদ গেলেন না। রবীন্দ্রনাথ রাখীবন্ধন প্রথার প্রবর্তন করলেন।

বঙ্গ-ভঙ্গকে কেন্দ্র করে আন্দোলন সর্বভারতীয় রূপ পেয়েছিল সেদিন। বালগঙ্গাধর তিলক, গোপাল কৃষ্ণ গোখলে, লালা লাজপৎ রায়, প্রমুখ নেতারা নেতৃত্ব দিলেন। ভারতবাসী বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রে দীক্ষা নিলেন।

দেশব্যাপী স্বদেশী আন্দোলনের ঝড় বয়ে গেল। বিলাতী কাপড় পরব না, বিলাতি দ্রব্য গ্রহণ করব না। এই ছিল তাঁদের সেদিনের আন্দোলনের মূল কথা। অফিস, আদালত, মাদকদ্রব্যের দোকানের সামনে চলল পিকেটিং।

সেদিন ওরা আন্দোলন দমনের কম চেষ্টা করে নি। ব্রিটিশ

সরকারের হাতে শত শত লোক বন্দী হয়ে অশেষ নির্যাতন ভোগ করতে লাগল। অকথ্য অত্যাচার চালাল ব্রিটিশ ইউনিয়ন জ্যাক পতাকার তলে দাঁড়িয়ে লাল মুখো গোড়ারা।

উনিশ শ' ছয় খৃষ্টাব্দে দাদা ভাই নৌরজী ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের তরফ থেকে স্বরাজ দাবী করলেন।

অত্যাচার, নির্যাতন, কারাগারের অসহনীয় অন্ধকার আর উৎপীড়ন কিন্তু আন্দোলনের টুটি চেপে ধরতে পারল না। চরম পন্থীদের বৈপ্লবিক কার্য্যকলাপ বাড়ল বই কমল না এতে। শ্রীঅরবিন্দ নেতৃত্ব দিলেন বাংলাদেশকে। সৃষ্টি হল বাংলায় বৈপ্লবিক যুগান্তর দল। বিপ্লবীদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল অত্যাচারী ইংরেজ কর্মচারী হত্যা করা। বোমা ও বন্দুক তৈরীর কারখানা স্থাপিত হল। অত্যাচারী ও কুখ্যাত ম্যাজিষ্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যা করতে গিয়ে ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী হুজরেই ধরা পড়লেন। প্রফুল্ল চাকী আত্মহত্যা করলেন, বিপ্লবী বীর বালক ক্ষুদিরামকে ওরা ফাঁসি কাঠে ঝুলাল।

মুসলমানেরাও জাতীয় আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাদের পিছিয়ে যেতে হল। উনিশ শতকের শেষের দিকে স্যার সৈয়দ আহম্মদের মত জাতীয়তাবাদী নেতাও কংগ্রেসের এ আন্দোলন থেকে মুসলমানদের দূরে থাকার নির্দেশ দিলেন। তিনি ভেবেছিলেন মুসলমানেরা পাশ্চাত্যশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে হিন্দুদের সমকক্ষ হতে না পারলে কংগ্রেস আন্দোলনের শেষ যে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে তাতে এই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দাবী উপেক্ষিত থেকে যাবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ আর সংখ্যালঘিষ্ঠ এই দুয়ের ভেদরেখা টেনে সহজেই মুসলমানদের প্রভাবিত করতে পারলেন সৈয়দ আহম্মদ। ১৯০৬ সালে তাই ঢাকা শহরে নবাব সলিমুল্লা সাহেবের উদ্যোগে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত

হল। মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এই লীগ কিন্তু বঙ্গ-ভঙ্গ সমর্থন করে বসল।

ভারতীয় জনগণের শান্তি ভঙ্গ হয়েছে। ওদের শান্তি নেই।

সুতরাং ভারতের বড়লাট লর্ড মিণ্টো একটি নতুন শাসন সংস্কারের প্রবর্তন করলেন। উনিশ শ' নয়ে মর্লি মিণ্টো সংস্কার প্রবর্তিত হল। কী দয়া ওদের। ভারতবাসীদের শাসনকার্য্যে সহযোগিতা কোরবার সুযোগ দেবে এই সংস্কার। কিন্তু কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসন কর্তৃপক্ষ জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মতামত উপেক্ষাই করে চললেন। হিন্দু মুসলমানের পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা করে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিরোধের বীজটিকে অঙ্কুরোদগমের সুযোগ করে দিল। এই তো হল শুধু লাভ।

না, কংগ্রেস সেদিন সন্তুষ্ট হয় নি এই নতুন সংস্কারে।

সন্তুষ্ট হয় নি সন্ত্রাসবাদীরাও।

তার প্রমাণ, ওদের বৈপ্লবিক কার্য্যকলাপ বন্ধ হল না বরং বেড়ে চলল দিনের পর দিন। কারণ ওরা মরীয়া। স্বাধীনতা ওদের চাই-ই। পরাধীন জাতি হিসেবে এত অত্যাচার মুখ বুঝে সহ্য করা যায় না।

উনিশ শ' এগার খৃষ্টাব্দে সম্রাট পঞ্চম জর্জ দিল্লীর দরবারে একটি ঘোষণার মাধ্যমে বঙ্গভঙ্গ রহিত করে দিলেন।

কিন্তু কোলকাতায় আর নয়। তাই রাজধানী স্থানান্তরিত করা হল দিল্লীতে। মাত্র তিন বছরের পর শুরু হল বিশ্ব যুদ্ধ।

এই বিশ্ব মহাযুদ্ধে ইংলণ্ড হল বিব্রত। ভারতীয় নেতারা আশা করলেন বিশ্ব মহাযুদ্ধ শেষে ইংরেজ সরকার ভারতকে অন্ততঃ স্বায়ত্ত শাসন দান করবেন। সুতরাং দ্বিধা কেন? অর্থ দিয়ে,

সৈন্য দিয়ে, যথাশক্তি প্রয়োগ করে ইংরাজদের সাহায্য কর। কোরলও তারা তাই। শুধু মাত্র আশা স্বায়ত্ব শাসন লাভ।

যুদ্ধ শেষ হল একদিন। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা।

ভারত সচিব ও ভারতের বড়লাট মিঃ মন্টেগু আর লর্ড চেমস্ ফোর্ড এক নূতন বিধান রচনা করলেন। ভারতের কেন্দ্রীয় শাসন ভার ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কর্তৃত্বাধীনে রইল, ব্যবস্থা পরিষদের সভ্য সংখ্যা বাড়িয়ে তার প্রভাব ও প্রতিপত্তি বাড়ানো হল। ভারত গভর্ণমেন্টের পক্ষ হ'তে ইংলণ্ড থেকে প্রয়োজনীয় দ্রব্য কেনার জন্য ও নানাবিধ খবর দেওয়া নেওয়ার জন্য একজন হাই-কমিশনার নিযুক্ত হ'লেন।

কোথায় স্বায়ত্ত শাসন। নেতৃবৃন্দের এত আশা সব বৃথা হয়ে গেল। বরং সন্ত্রাস বাদীদের আন্দোলন ওদের কার্য্যকলাপ বন্ধ করার জন্য রাউল্যাট কমিটি রাউল্যাট আইন প্রণয়ন করিলেন। তা বিধিবদ্ধও হল। রাউল্যাট আইনের প্রতিবাদ জানান হল সারা ভারত জুড়ে।

ধর্মঘট। আর সভা। প্রতিবাদ আর প্রতিবাদ।

পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগ। প্রতিবাদ সভা ডাকা হয়েছে। রাউল্যাট আইন মানি না। সভায় সহস্র সহস্র নর-নারী এসেছেন তারা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে রাউল্যাট আইনের প্রতিবাদ জানাতে যোগ দিয়েছেন সভায়।

ব্রিটিশ সরকারের অহঙ্কারে ঘা লাগল। মাইকেল ও ডায়ার নামে একজন ইংরেজ সেনাপতি সভায় সমবেত নর-নারীকে উপহার দিলেন গুলি। নির্দয় ভাবে গুলি চালালেন তিনি। স্বাধীনতা-কামী হিন্দু-মুসলমান ও শিখের রক্তে জালিয়ানওয়ালাবাগের মাটি ভিজে গেল। রক্তে রাঙা হয়ে উঠল জালিয়ানওয়ালাবাগ।

ভারতের সর্বত্র বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনাকে কেন্দ্র করে। কিন্তু ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট নির্বিকার। দুঃখ নয়, সমবেদনা নয়, অনুতাপ নয়। ও-ডায়ারের সঙ্গে সঙ্গে পাঞ্জাবের ইংরাজ গভর্ণর সুর মিলিয়ে ঘোষণা কোরল, ও-ডায়ার কোন অন্যায় করে নি, ভুল করে নি। ও-ডায়ার যা করেছে তা যথাযথ কর্তব্য পালন করেছেন।

আর বিলাতের অভিজাত মহিলারা চাঁদা তুলে ও-ডায়ারকে উপহার দিলেন—যার মূল্য ভারতীয় মুদ্রায় অন্ততঃ তিন লক্ষ টাকা। ও-ডায়ারের বীরত্বে তারা মুগ্ধ। নিরস্ত্র ভারতবাসীকে গুলিবিদ্ধ করে ও-ডায়ার নাকি বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন।

জাতীয় আন্দোলনের এই অধ্যায়েই ভারতের মুক্তি সংগ্রামের পুরোভাগে এলেন মোহন দাস করম চাঁদ গান্ধী।

উনিশ'শ কুড়ি খৃষ্টাব্দে গান্ধীজী নেতৃত্ব দিলেন কংগ্রেসকে। শুরু হল, অহিংস অসহযোগ আন্দোলন। এ আন্দোলনে কিন্তু মুসলমানেরাও যোগ দিল কারণ কংগ্রেস খিলাফৎ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল।

অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল ভারতে ব্রিটিশ শাসন অচল করা। ইংরেজদের সঙ্গে সব সহযোগিতা বন্ধ করেই তাদের শাসন অচল করতে চেয়েছিলেন গান্ধীজী। বিদেশী পণ্য বর্জন করা হল। আইন অমান্য ও কর বন্ধ করা হল। ইংরেজ সরকার অহিংসা নীতি বন্ধ করতে চাইলেন তাদের চণ্ডনীতি প্রয়োগ করেই। হাজার হাজার দেশসেবক কারাবরণ করলেন। কারাগারে চলতে লাগল নির্যাতন। নেতারাও বাদ পড়লেন না। গান্ধীজী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, মতিলাল নেহরু, মৌলানা মহম্মদ আলি, শৌকত আলি সবাই—ওদের চণ্ডনীতির আওতায় পড়ে সইতে লাগলেন অকথ্য অত্যাচার।

কিন্তু কত আর এই অত্যাচার সহ্য করা যায়। চৌরী চৌরা নামক স্থানে আন্দোলনকারীরা হিংসাত্মক কার্য্যে লিপ্ত হলেন। ওদের সব ধৈর্য্যের বাঁধ যে ভেঙে গেছে। কিন্তু অহিংসার পূজারী গান্ধীজী আন্দোলন বন্ধ করার নির্দেশ দিলেন। সেটা উনিশ শ বাইশ খৃষ্টাব্দের কথা।

ব্রিটিশ সরকার ভয় পেল ভারতের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে। শঙ্কাতুর হল ওরা। হিন্দু-মুসলমানের বিভেদ সৃষ্টির জন্য তাই তৎপর হয়ে উঠল। এবারে উত্তর ভারতে ইংরেজ সরকারের প্রচেষ্টাতেই হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে শুরু হল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা।

উনিশ শ' চব্বিশে গান্ধীজী জেল থেকে খালাস পেয়ে এই সঙ্কট অবস্থা দেখে ব্যথা পেলেন। সাম্প্রদায়িক অশান্তি দূর করতেই হবে। তিনি ব্রত নিলেন উভয় জাতির মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার।

দেশবন্ধু, চিত্তরঞ্জন, মতিলাল নেহরু প্রমুখ জনপ্রিয় নেতারা কারাগার থেকে বের হয়ে এসেই স্বরাজ্যদল গঠন করলেন। স্বরাজ্য দল আইন পরিষদে প্রবেশের সুযোগ পেল। প্রতিপদে বাধা দিতে লাগল গভর্ণমেন্টকে। ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় সমস্যা পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্য নিয়ে সাইমন কমিসন পাঠালেন। উনিশ শ' সাতাশে এই কমিসনে ভারতবাসী যোগ দিল না। কংগ্রেস নেতৃত্বে ওরা বয়কট কোরল এই কমিসনকে। কোলকাতায় কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশনে ভারতের স্বায়ত্ত শাসন লাভের এক প্রস্তাব গ্রহণ করা হল।

বাংলার তরুণ সম্প্রদায়কে তখন স্বপ্নে বিভোর করে রেখেছেন নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু। তাঁরই নেতৃত্বে ওরা দাবী করলেন পূর্ণ স্বাধীনতার। আংশিক স্বাধীনতা নয় একে-বারে পূর্ণ স্বাধীনতাই তাঁদের কাম্য। পরের বছর অবশ্য লাহোর কংগ্রেসে পণ্ডিত জহরলাল নেহরুও কংগ্রেসের তরফ থেকে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করলেন।

গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেস আবার আইন-অমান্য আন্দোলন শুরু

করলেন। ভারতের সর্বত্র লবন-আইন ভঙ্গ করা হল। দেশে তখন তুমুল উদ্দীপনা। ভারতের বিপ্লবীদের ডাক দিলেন গান্ধীজী। তিনি ঘোষণা করলেন,

Non-violence may be accepted as creed or policy I am out to destroy this Satanic Government.

গান্ধীজীর আহ্বানে সেদিন সাড়া দিয়েছিলেন বিপ্লবীরা। যদিও অহিংস নীতিতে ওদের আস্থা নেই বিন্দু মাত্র। তবু দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কথায় তাঁরা কিছুদিনের জন্য বৈপ্লবিক কার্য্য কলাপে ক্ষান্তি দিয়েছিলেন কারণ গান্ধীজী প্রতিশ্রুতি দিলেন, এবারে নিশ্চয়ই তিনি স্বাধীনতা এনে দেবেন।

ব্রিটিশ সরকার আন্দোলন দমনের জন্য সর্ব শক্তি নিয়োগ করলেন। নিরস্ত্র অহিংস জনতার উপর এল পুলিশ মিলিটারির লাঠির আঘাত আর বন্দুকের গুলি। নেতৃবৃন্দ এবং হাজার হাজার সত্যাগ্রহী ধরা পড়ল। ইংরেজ কারাগার দেখতে দেখতে ভরে গেল।

ইংলণ্ডে এই সময় ডাকা হল গোল টেবল বৈঠকে। ভারতীয় নেতাদের আমন্ত্রণ জানানো হল এই বৈঠকে। গান্ধীজী বৈঠকে যোগ দিলেন। কিন্তু কোন আপোষ মীমাংসা হল না।

গান্ধীজী তাঁর প্রতিশ্রুতি রাখতে পারলেন না।

রচিত হল নতুন ইতিহাস।

শুরু হল নয়া অধ্যায়।

না, আর আপোষ মীমাংসা নয়। আর কোন আলোচনা নয়।

মানুষ স্বাধীনতা নিয়েই জন্মেছে। ব্রিটিশ সরকার সেই স্বাধীনতাকে খর্ব করে রেখেছে তার শক্তি ও নির্যাতন দিয়ে।

সুতরাং আর কোন কথা নয়।

এবারে রুখে দাঁড়াবার পালা।

শুরু হল উনিশ শ' তিরিশের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম।

হলই বা সামান্য অস্ত্র-শস্ত্র। নাই বা হল তারা সংখ্যায় অনেক বেশী। তারা এও জানে ওদের ক্ষমতা নেই সমগ্র ব্রিটিশ শক্তি নির্মূল করার। তারা এও জানে মৃত্যু অনিবার্য।

তবু তো বাংলার দামাল ছেলেরা সেদিন শপথ নিয়েছিল মৃত্যুকে বরণ করেই মৃত্যুঞ্জয়ী হওয়ার। ওরা যে জানত তাদের নিঃশেষে আত্মবিসর্জন ব্যর্থ যাওয়ার নয়! 'নিঃশেষে প্রাণ, যে করিবে দান, ক্ষয় নাই, তার ক্ষয় নাই' এ মহান বাণী ছিল তাদের অন্তরে জাগরূক।

ওরা সেদিন মৃত্যুকে ভয় পায় নি—পরবর্তী কালের 'ইংরেজ, ভারত ছাড়' আন্দোলনের পথিকৃৎ ওরা।

ওরা সেদিন মনে-প্রাণে বিশ্বাস করত:

The only lesson required in India at present is to learn how to die and the only way to teach it by dying ourselves.

উনিশ শ' তিরিশের ১৮ই এপ্রিল।

সারা বাংলা অবাক মেনেছে।

ভারতের অভ্যন্তরে বিশেষতঃ বাংলা ও পাঞ্জাবে তখন সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি পর্ব চলেছে। রাসবিহারী বসু, মানবেন্দ্রনাথ রায় প্রমুখ ভারতীয় নেতারা তখন ব্রিটিশ শত্রুদের কাছ হতে অস্ত্র সংগ্রহ করে ভারতে পাঠাবার ব্যবস্থা করেছেন।

সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপ চলছে পুরোদমে।

খবর পাওয়া গেল, ১৮ই এপ্রিল রাত্রে সূর্য্যসেনের (মাষ্টারদার) নেতৃত্বে চট্টগ্রামের বীর বিপ্লবীরা চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করেছে। আঘাত করেছে ব্রিটিশ শাসকের একটি শক্তিশালী ঘাঁটির উপর।

চট্টগ্রাম স্বাধীন। চট্টগ্রাম মুক্ত। পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করেছে ওখানকার বীর বিপ্লবীরা।

আহত ব্রিটিশ সিংহ ক্ষ্যেপে উঠল।

ব্রিটিশ ইউনিয়ন জ্যাকের অপসারণ ওরা সইতে পারল না।

ক্ষ্যেপে উঠল ওরা। একেবারে ক্ষ্যেপা কুকুরের মতই।

ঢাকা শহর হল ওদের আক্রমণের কেন্দ্রস্থল। ওরা ভাবল চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিপ্লবীরা ঢাকায় আশ্রয় নিয়েছে। সুতরাং ঢাকার মানুষের উপর শুরু হল প্রচণ্ড অত্যাচার চলল নির্মম নির্যাতন।

অত্যাচার আর অত্যাচার !

বিপ্লবীদের লুকিয়ে রেখেছে তোমরা ঢাকার মানুষেরা। সুতরাং তোমাদের রেহাই নেই, মুক্তি নেই ওদের আমাদের হাতে না দিলে তোমরা মরবে।

পরবর্তী বিপ্লবের ইতিহাসের নূতন পত্তন করল ঐ চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বীর বিপ্লবীরাই। ওরাই দেখাল নূতন পথ। বীরত্বে, দেশপ্রেমে' সংগঠনের ক্ষেত্রে তাঁরা যে নূতন দৃষ্টান্ত রাখলেন তা তো ব্যর্থ হওয়ার নয়! তা তো মুছে যাওয়ার

নয়! সে তো ক্ষণিকের স্মৃতি নয়! সে যে মনের শিলালিপিতে দাগ কেটে যাওয়া অধ্যায়!

ওঁদের পথ ধরেই তো পরবর্তী কালে বৈপ্লবিক কাজগুলো ফলে-ফুলে পুষ্পে-পত্রে এমন ফলপ্রসূ হয়ে উঠল। ওঁদের অমর আত্মাকে ধ্রুবতারা করেই তো ঝাঁপ দিলেন বিপ্লবীরা মৃত্যু-খেলায়।

বৈপ্লবিকদের কাজকর্ম তখন বেড়েছে।

গুপ্ত বিপ্লবী আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের শায়েস্তা করার ভার নিল ইংরাজ সরকার।

ঢাকায় তখন সুপারিনটেনডেণ্ট অফ্ পুলিশ কুখ্যাত মিঃ ইঃ হড্সন। কী করেন নি হড্সন? ঢাকায় হিন্দু মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধালেন হড্সন। হিন্দু মুসলমানের ঐক্য শক্তিকে বড় ভয় করেছিল সেদিন ব্রিটিশ সরকার। সুতরাং ভাঙ ওদের ঐক্য, নিয়ে এস ওদের মধ্যে বিরোধ। পেরেছিলেন হড্সন। রক্তে রক্তে লাল হয়ে গেল ঢাকার মাটি।

ছাত্র পিকেটিং ভাঙতে পাঠান সৈন্য নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন হড্সন। পিটিয়ে ছত্রভঙ্গ করার- আদেশ দিয়েছেন ছাত্রদের, জনতাকেও। লাঠির আঘাতে সেদিন আহত হয়েছিল অনেক নিরীহ পথ চলতি মানুষ। মারা গিয়েছিল একজন নির্দোষ ছাত্র—যে সবে মাত্র আই, এ, পাশ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হ'তে এসেছিল সেদিন। ঐ উনিশ শ' তিরিশের ২১শে জুলাই।

সত্যাগ্রহীরা তো নিরস্ত্র। কারাগার, পেনাল কোডের শত শত ধারা, সাত সাতটা অর্ডিন্যাস রয়েছেই, কিন্তু নরপিশাচ হড্সন ঢাকা শহরে এরও উপরে নিয়ে এলেন লাঠিবাজী।

কিন্তু হড্সনেরও কাল ফুরিয়ে এল।

বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স।

সন্ত্রাসবাদী বৈপ্লবিক সংস্থা।

অত্যাচারী ইংরাজ নিধন যজ্ঞের পুরোহিত এঁরা।

উনিশ শ' তিরিশের আগষ্ট। ওঁরা সঠিক খবর পেয়েছেন লোম্যান ও বাংলার গভর্ণর শীঘ্রই ঢাকা যাচ্ছেন। বাংলার ইনসপেক্টর জেনারেল অব্ পুলিশ মিঃ এফ জে লোম্যান অনেক কুকীর্তি ও অত্যাচারের সাক্ষী। গভর্ণর ও লোম্যানের ঢাকায় অবস্থানের স্বল্পকালের সুযোগটাকে কিছুতেই হাত ছাড়া করা চলে না। ওদের একজনের রক্তের অন্ততঃ প্রয়োজন। তা না হলে মাতৃপূজার এমন আয়োজন যে বৃথা যাবে।

ঢাকা মিট ফোর্ড মেডিক্যাল স্কুলের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র বিনয় বোস তখন কোলকাতায়। গ্রীষ্মের ছুটি যে। দলের অন্যতম নেতা ভূপেন্দ্র-কিশোর রক্ষিত রায় বিনয় বোসকেই বেছে নিলেন আগামী মহা যজ্ঞের পুরোহিত হিসেবে। জানালেন, গভর্ণর অথবা লোম্যান দু'জনের একজনকে চাই-ই চাই।

বিনয় মেনে নিলেন সে আদেশ।

মনে তাঁর দৃঢ় আত্ম-প্রত্যয়। রেবতীমোহন বসুর পুত্র বিনয় বোস জানেন তাঁর শিকারী পিতার গুলি কখনও মিস্ করে না। বাপ্‌কা বেটা হওয়ার মনোবল তাঁর আছে। বিনয় জানেন সামনে তাঁর বিরাট পরীক্ষা, আর এ পরীক্ষায় তাঁকে উত্তীর্ণ হতেই হবে এবং সসম্মানে। তা না হ'লে মেজদা হরিদাস দত্তের ঠাট্টার জবাব দেবেন কী করে?

তুমি তো বড়লোকের ছেলে বিনয়। ডাক্তারী পাশ করেই

বিলেত যাবে। তারপর অনেক বড় ডিগ্রী নিয়ে যখন দেশে ফিরবে তখন কি আর দেশের দৈন্য-দশার কথা ভাবতে পারবে তুমি ?

না, বিনয় এ প্রশ্নের উত্তর কথায় দেননি। দিতে চেয়েছিলেন কাজে।

তাই ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায় শিয়ালদহ হ'তে ঢাকাগামী গাড়ীর তৃতীয় শ্রেণীতে বিনয়কে উঠিয়ে দিয়ে তাঁর শেষ নির্দেশ যখন জানিয়ে দিলেন, গভর্ণর বা লোম্যান যে কোন একজনকে চাই-ই; তখন হ'তেই তার একমাত্র ধ্যান হয়েছিল যে করেই হোক একজনকে আমার চাই-ই চাই। এর জন্য যে কোন মাশুল দিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন।

বিনয় ঢাকায় পৌঁছেছিলেন ঠিক সময়েই।

আরমানি টোলায় অস্ত্র রাখা হয়েছিল। নতুন শক্তিশালী রিভলভার। কোলকাতা হ'তে সদ্য আমদানি করা হয়েছে এ অস্ত্র। পৌঁছে দিয়ে গেছেন এ রিভলভার সকন্যা সুরেশবাবু। অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বনের জন্যই উজ্জ্বলা মজুমদারকে সঙ্গে নেওয়া। সারা রাস্তা যক্ষের মত বুকে আগলে রেখে উজ্জ্বলা পৌঁছে দিয়ে গেলেন রিভলভারটি। সুরেশ মজুমদার নিশ্চিন্ত।

ঢাকায় বেঙ্গল ভলান্টিয়াসের এ্যাকসন স্কোয়ার্ডের অন্যতম সদস্য সুপতি রায়ও বিনয়কে সেই একই নির্দেশ দিলেন।

কিন্তু গভর্ণরের ধারে কাছে পৌঁছানোর সুযোগ বিনয় সেদিন পেলেন না। বার কয়েক চেষ্টা করেও সুযোগ পেলেন না।

অস্থির হয়ে উঠলেন তিনি। অস্থিরতা তাঁর সর্বাঙ্গে। পরীক্ষায় অসাফল্যের গ্লানি তখন তাঁর চোখে মুখে। এ কী হল ? তিনি হেরে গেলেন ? হেরে যাবেন ? না-না, হারতে পারেন না তিনি।

পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হওয়ার সুযোগ পেলেন বিনয় উনিশ শ' তিরিশের উনত্রিশে আগস্ট।

নৌ বিভাগের পুলিশ সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট মিঃ বাড অসুস্থ। চিকিৎসার জন্য তাঁকে মিটফোর্ড মেডিক্যাল স্কুল হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে। তাঁকে দেখতে এসেছেন মিঃ এফ, জে, লোম্যান।

বিনয় হাসপাতালে এসেছেন অস্থির মন নিয়েই। তিনি তো এ স্কুলেরই চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। সুতরাং সর্বত্র তাঁর অবারিত দ্বার।

বিনয় চমকে উঠলেন হাসপাতালে পা দিয়েই।

এ কী! এত পুলিশ কেন! সাদা পোষাকে গোয়েন্দাও অনেক।

জানতে পারলেন, অসুস্থ মিঃ বাডকে দেখতে এসেছেন লোম্যান, বাংলার ইনস্‌পেক্টর জেনারেল অব পুলিশ।

মুহূর্তের মধ্যে তাঁর মনে পড়ে গেল ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়ের শেষ নির্দেশ। মনে পড়ল তাঁর, সুপতি রায়ের সেই নির্দেশেরই প্রতিধ্বনি। লোম্যান অথবা গভর্ণর।

আর মুহূর্তও অপচয় করা চলে না। অস্ত্র চাই।

বেরিয়ে গেলেন বিনয় বোস।

আবার ফিরে এলেন সঙ্গে সঙ্গেই। এবার সঙ্গে এনেছেন আরমানি টোলায় লুকিয়ে রাখা রিভলভারটি।

দৃঢ় আত্ম-বিশ্বাস আর আত্ম-প্রত্যয় নিয়ে বিনয় বোস এখন উজ্জ্বল। কোথাও আর সেই পূর্বের অস্থিরত, চঞ্চলতা নেই।

এখন লক্ষ্য এক, চিন্তা এক।

মিঃ বাডকে দেখে লোম্যান ফিরে আসছেন। তাঁর সঙ্গে

রয়েছেন ঢাকার পুলিশ সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট কুখ্যাত মিঃ ই, হডসন। ওরা দুজনে মিঃ বাডের কেবিন থেকে বের হয়ে সবে মাত্র হাসপাতালের সিঁড়ির পৈঠায় পা রেখেছেন।

······গ্রাম, গ্রাম্‌।

দেবদারু গাছের আড়ালে অপেক্ষমান মৃত্যুদূতের হাতে গর্জন করে উঠেছিল রিভলভার।

অব্যর্থ লক্ষ্য।

সাবাস! বাপকা বেটা!

না, বাবার মত দক্ষ শিকারী তিনি কোনদিনই ছিলেন না। বাবার বন্দুক নিয়ে চেষ্টা চালালেও তা তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য ফলপ্রসূ হয় নি কোনদিনই।

রিভলভার বা পিস্তল চালনা করার গোপন ট্রেনিং নেওয়ার সুযোগও তাঁর তেমন আসে নি। তা ছাড়া সুবিধাজনক ট্রেনিং কেন্দ্র খোলার সুযোগই বা ছিল কোথায়? কোথাও সন্দেহজনক শব্দ হলেই আর উপায় ছিল না—পুলিসের সন্ধানী চোখ ঠিক সেখানে গিয়ে পৌঁছাত আর নিয়ে যেত সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষার্থী ও শিক্ষাদাতা উভয়কেই। সুতরাং সে আশা বৃথা।

তবু এর মধ্যেই শিক্ষার্থীরা শিক্ষাও নিতেন। রেল-লাইনের ধারে। গাড়ী আসার সময় বুঝে চলত ওঁদের শিক্ষা। গাড়ীর শব্দে রিভলভারের শব্দ কোথায় ডুবে যাবে। অতএব নিশ্চিন্ত ওঁরা এখানে।

কিন্তু বিনয় তেমন ভাবেও শিক্ষা পান নি। আসলে তাঁর লক্ষ্য-ভেদের মূলে ছিল গভীর আত্ম বিশ্বাস। শক্তিমান বৃটিশ তাঁর শত্রু। অতএব এ শত্রুদের ক্ষমা করা চলে না। যে কোন ভাবেই হোক না কেন লক্ষ্য ঠিক রাখতেই হবে।

মেজর সত্য গুপ্তের সঙ্গে লাহোর কংগ্রেসে এসেছিলেন বিনয়

বোস। মেজর গুপ্ত অধিবেশন চলাকালেই প্রশ্ন করেছিলেন বিনয়কে পিছনের সারিতে বসে থেকে ফিস্ ফিস্ করে। জানতে চেয়েছিলেন তিনি বক্তার টুপি এক গুলিতে উড়িয়ে দিতে পারে কি না বিনয়।

বিনয় জানিয়েছিলেন—তিনি এ কাজ অত্যন্ত অনায়াসে করতে পারেন। অবাক হয়েছিলেন মেজর গুপ্ত বিনয়ের কথা শুনে, কারণ বিনয় তো কোনদিন সে রকম ট্রেনিং নেওয়ার সুযোগ পান নি।

আসলে তাঁর গভীর আত্ম-বিশ্বাস তাঁকে পথ দেখিয়েছিল। তিনি পেরেছিলেন লক্ষ্য ভেদ করতে।

তাই ভাবতে অবাক লাগে বনের অসহায় পাখিগুলো মারতে গিয়ে যে বিনয়ের হাত বারবার কেঁপে উঠেছে সেই বিনয় কিন্তু ইংরেজ নিধনে কোনদিনই লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেন না।

না, মিস্ হয় নি গুলি। লোম্যান আর হডসন দুজনের দেহই লুটিয়ে পড়ল সিঁড়ির পৈঠায়।

সচকিত হয়ে উঠল সকলে! প্রহরী, গোয়েন্দা বিভাগের পুলিশ সকলেই। গুলির শব্দ ওদের কানেও পৌঁছেছে।

বিনয় পরিতৃপ্ত। তিনি পেরেছেন বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের নেতার দেওয়া দায়িত্বটুকু পালন করতে।

খুশীতে বোধ হয় তাঁর চোখ দুটো তখন চক্ চক্ করে উঠেছিল। তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন লোম্যান আর হডসন দুজনকেই লুটিয়ে পড়তে। অত্যাচারের জবাব পেয়েছেন লোম্যান, জবাব পেয়েছেন হডসন।

খুশীতে আর এক জনের চোখও জ্বল্‌জ্বল্ করে উঠেছিল সেই সময়।

লোভ! লোভ! দুর্নিবার লোভ পেয়ে বসেছিল সেদিন ঐ

লোকটাকে। তাই বিনা মেঘে বজ্রপাতে যখন সবাই সচকিত, সবাই হতভম্ব, কিংকর্তব্যবিমূঢ়, তখন কিন্তু সরকারী কণ্ট্রাক্টর সত্যেন সেন দিশেহারা হয়ে পড়লেন না। ঠিক করে নিলেন আগামী দিনের কর্তব্য।

মন তখন তাঁর অনেক দূরে স্বপ্ন বয়নে ব্যস্ত। মোটা পুরস্কার, বিরাট খেতাব তিনি যেন চোখের সামনে ভাসতে দেখলেন।

সুতরাং আর দেরী নয়। বৃথা কালক্ষেপে এমন সুযোগ নষ্ট হতে দেওয়া যায় না।

তিনি লক্ষ্য করেছেন দেবদারু গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকা বিনয় বোসকে। সুতরাং ছুটে গেলেন ঝড়ের বেগে। ঝাপটে ধরলেন তাঁকে কিন্তু বিনয় বোস কম কিসে ?

সত্যেন সেনের চোয়াল লক্ষ্য করে একটা বিরাশি সিক্কা ওজনের এক ঘুসি তুললেন। ঐ একটি মাত্র ঘুসি খেয়েই বীর পুরুষ দেশদ্রোহী ঘর শত্রু বিভীষণ সত্যেন সেনের সব আশা নির্মূল হয়ে গেল।

লোভের দফার একেবারে রফা করে ছাড়লেন বিনয় বোস।

বিনয় ততক্ষণে অত্যন্ত কৌশলের সঙ্গে উঠে গেছেন হাসপাতালের উঁচু প্রাচীরের উপর।

কিন্তু তারপর ?

কোন্ পথ দিয়ে যাবেন ? মুহূর্তের দ্বিধা। তারপরেই নিজের কর্তব্য নির্ধারণ করে ফেললেন।

প্রত্যুৎপন্নমতি বিনয় সামনের বাড়ির একটি জলের ট্যাঙ্কের উপর উঠে একবার সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। তারপর একলাফে অদৃশ্য হয়ে গেলেন বাড়ীর অন্দর মহলে।

আর তাঁকে দেখা গেল না।

হারিয়ে গেলেন বিনয় ওদের চোখের সামনে থেকে।

না, লোম্যান বাঁচেন নি। কোলকাতার বিখ্যাত সার্জেন লেঃ কর্ণেল ডবলিউ এল হর্ণেট বিমান যোগে ছুটে এলেন ঢাকায়। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। লোম্যানকে বাঁচানো গেল না।

লোম্যান মারা গেছে। বিদ্যুতের মত সংবাদটা ছড়িয়ে পড়ল সারা ঢাকা শহরে। গোটা শহরটা যেন ঝিম মেরে গেল সেদিন। রাস্তায় লোক চলাচল নেই বললেই চলে। শুধু জনবিরল রাস্তাগুলো বাড়ীর পাশ ঘেঁষে চোখ না ফোটা ময়াল সাপের মতই পড়ে আছে।

সেদিন ঢাকা শহরের অধিবাসীরা জানত, ব্রিটিশ সরকার লোম্যানের মৃত্যুকে সহজে মেনে নেবে না। একেই তো বিপ্লবীদেব উপর ওদের প্রচণ্ড রাগ। তার উপরে লোম্যান হত্যা। এ ক্ষমা করা যায় না।

গোয়েন্দা পুলিশের বড় কর্তা লোম্যানের হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য বদ্ধপরিকর হল বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী। যে করেই হোক্ লোম্যানের হত্যাকারীকে বজা করতেই হবে।

প্রথমেই ওদের লক্ষ্য পড়ল মিটফোর্ড মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্রদের উপর।

ওরা নিশ্চয় একাজ করেছে।

তা না হলেও হত্যাকারীকে ওরা চেনে।

চেনে না বললেই বা ব্রিটিশ শাসক শুনবে কেন?

মিঃ বাড অসুস্থ, তাঁকে দেখতে আসছেন কোলকাতা হ'তে লোম্যান—এ খবর মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্রেরা ছাড়া অন্যের পক্ষে জানা এত সহজ নয়।

নিশ্চয়ই বিপ্লবী দলের সঙ্গে কারও যোগ-সাজস আছে।

সুতরাং পিটাও ওদের।

বে-ধরুড় পিটুনি শুরু হল ছাত্রদের উপর।

উঃ, কী সে মার!

ভাল মন্দের জাত বিচার নেই। বাঙালী মাত্রেই মন্দ তাদের কাছে। ভারতীয় মাত্রই দায়ী লোম্যান হত্যার জন্যে।

স্কুলের ছেলেদের পিটালো। নির্মম প্রহারে ওদের অনেকেই হাত-পা ভেঙে হাসপাতালে জায়গা নিল। কিন্তু আর জায়গাও নেই হাসপাতালে। মেডিক্যাল স্কুল হোষ্টেলে ঢুকে ছাত্রদের জিনিষ-পত্র ভেঙে তছ্‌ নছ্‌ করে দিল।

সব ছাত্রই তো আর বিনয় নয়!

সবাই তো আর অসীম অত্যাচার সহ্য করার শক্তি নিয়ে জন্মায় না!

নির্মম প্রহারে জর্জরিত একজন ছাত্র বিনয়ের নাম বলে দিল পুলিসের কাছে।

কাপুরুষ!

তুমি না এই বাংলা দেশেরই ছেলে! তোমার দেশ না পরাধীন? শুধু ওরাই এই পরাধীন দেশের কথা ভাববে? তুমি ভাববে না? সেটা কী কথা?

তাই বোধ হয় বিপ্লবীরা বুঝতে পেরেছিল, পৃথিবীতে পরাধীন জাতির বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই। তাদের মৃত্যুই একমাত্র উপঢৌকন।

ওরা এত অত্যাচার সহ্য করে শেষ পর্যন্ত মৃত্যু বরণ করবার জন্য প্রস্তুত থাকে। আর তুমি লাঠির ঘা সইতে না পেরে নাম প্রকাশ করে ফেললে! ছিঃ ছিঃ! কী ঘেন্না, কী ঘেন্না।

তুমি নিজের চোখে দেখেছ, বিনয় গুলি ছুঁড়েছিল ?

ধন্যি তোমরা ! সবাই সত্যেন সেন, ঘর-শত্রু বিভীষণ।

এমন বিভীষণ অনেক ছিল। শত শত। অগুণতি। ওদের নিয়েই কিন্তু ঘর করতে হত বিপ্লবীদের।

পুলিশ অপচয় কোরল না সময়ের। (বিনয় বোসের একটা ফটো ওরা সংগ্রহ করে নিল। কোথায় পালাবে বাছাধন !)

(থানা, রেল স্টেশন, পোষ্টাফিস, অফিস-আদালতের প্রকাশ্য স্থানে টাঙিয়ে দিল সেই ছবি। সূত্রাপুর, গেণ্ডারিয়া, উয়ারী, বাংলা বাজার কোথাও বাদ রইল না। তেরাস্তার মোড়ে মোড়ে দেওয়ালের গায়ে বড় বড় হরফে লিখে দিল :

লোম্যানের হত্যাকারী ! বিনয় বোসকে ধরিয়ে দিতে পারলে নগদ দশ হাজার টাকা পুরস্কার।)

মোটা পুরস্কার নিঃসন্দেহ।

কিন্তু সন্ধান পাওয়া গেল না বিনয়ের।

পুলিশ ব্যর্থ হল। ব্যর্থ হয়ে ক্ষ্যেপে গেল আরও।

অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সমাজ আর পুলিসের পোষা গুণ্ডাদল শুরু করল মারপিট, গুণ্ডামী আর অত্যাচার। লুণ্ঠন করতে লাগল মানুষের যথা সর্বস্ব। ওদিকে পুলিশের নির্যাতন আর অত্যাচার।

মেয়েরাও বাদ গেল না। ইংরেজ জাতি বাহবা কুড়াবার চেষ্টা করে, ওরা বীরের জাত। নারীর সম্মান ওদের কাছে সর্বাগ্রে। সেই ইংরেজ কিন্তু নারী নির্যাতনে ছাড়িয়ে গেল অন্য সকল জাতকে। উলঙ্গ করে ওদের প্রহার করা হল ; ওদের সম্ভ্রম, ওদের সম্মান কেড়ে নিল বীরের জাত ইংরেজ।

তবু কিন্তু ঢাকার মানুষ নির্বিকার।

নির্বিবাদে ওরা সেদিন সহ্য করেছিল সব অত্যাচার, সব নির্যাতন।

প্রমাণ?

প্রমাণ বিনয় বোসকে ওরা ধরিয়ে দেয় নি। তুলে দেয় নি নর পিশাচ ইংরেজদের হাতে। খেতাবের এবং পুরস্কারের লোভ সামলে নিয়েছিল অনেকেই।

আসলে তখন অনেকের মনেই আগুন ধরেছে। বিপ্লবের আগুন। সে আগুন শান্ত করতে পারে বিনয়ের মত ইস্পাত কঠিন ছেলেরাই।

সেদিন ওরা সে কথা বুঝেছিল।

আর বুঝেছিল বলেই মেডিক্যাল স্কুল থেকে বের হয়ে পাশের বাড়ীর যে ঘরটায় এসে ঢুকেছিল বিনয়, সেখান থেকে অনায়াসেই ধাতস্থ হয়ে নিয়ে ভাবী কর্মসূচী নির্ধারণ করে পথে নামতে পেরে-ছিলেন। অত্যন্ত অনায়াসে।

ভেবে নিয়েছিলেন বিনয়, কোথায় যাবেন এরপর?

কলেজ হোষ্টেলে ফেরা চলে না। ওখানে যাওয়া মানেই ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদীর ফাঁদে পা বাড়ানো। তাহলে উপায়? তার চেয়ে পথই ভাল!

কিন্তু পথ আর কতক্ষণের জন্যই বা নিরাপদ?

ঠিক তখনই তার মনে পড়ল, বক্সী বাজার যেতে হ'বে।

যেমন ভাবা তেমনি করা।

সঙ্গে সঙ্গে একটা খালি ঘোড়ার গাড়ীও পেয়ে গেলেন তিনি। কিন্তু না, তাড়া-হুড়ো করলেন না। কোচ্-ম্যানকে সন্দেহের অবকাশ দেওয়া চলে না। সুতরাং রীতিমত দরদস্তুর করে গাড়ীতে উঠে বসে হুকুম করলেন, বক্সী বাজার।

বক্সী বাজারে পৌছে গাড়ীটা ছেড়ে দিয়ে বিনয় উঠলেন মণি সেনের বাড়ী।

মণি সেন বিনয়েরই সহকর্মী।

তৎপর হলেন মণি সেন।

এখন তাঁর একমাত্র কর্তব্য বিনয়ের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা।

এ বিষয়ে কোন ভুলচুক বিপ্লবী দল অন্ততঃ ক্ষমা করবে না।

না, আর দেরী নয়। অহেতুক ভাবলেও চলবে না।

মণি সেন তক্ষুণি হাজির হ'লেন লীলা নাগের (রায়ের) কাছে। ইনি ঢাকার বিপ্লবী নায়িকা। শ্রী সংঘের অন্যতমা পরিচালিকা লীলা নাগ।

বিনয়কে বাঁচাতে হ'বে, কিছু টাকা দিন লীলাদি।

লীলা নাগ বুঝলেন সব কিছু। বিন্দুমাত্র দ্বিরুক্তি না করে কিছু টাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। যা হাতের কাছে পেলেন তাই দিলেন।

সারাদিন মণি সেন বিনয়কে নিজের বাড়ীতেই রাখলেন।

দিন শেষে সন্ধ্যা এল।

মণি সেন চুপি চুপি বেরিয়ে গেলেন বিনয় বোসকে সঙ্গে নিয়ে। হাজির হ'লেন দলের অন্যতম নেতা সুপতি রায়ের কাছে।

রাত্রে মেস নিরাপদ নয়। তাই ভাবতে হল সুপতি রায়কে। কোথায় রাখা যায় বিনয়কে? একটা নিরাপদ আশ্রয় তো দরকার।

বঙ্গেশ্বর রায়, নেপাল নাগ, আর একজন বিনয় বোস এগিয়ে এলেন সুপতি বাবুকে সাহায্য করতে, তাঁর আদেশ পালন করতে।

কি করতে হ'বে আপনি বলুন সুপতি-দা।

সুপতি রায় ভাবলেন কিছুক্ষণ।

চোখে মুখে তাঁর ফুটে উঠল খুশীর আভাস। ইউরেকা! তিনি পেয়েছেন। খুঁজে পেয়েছেন আশ্রয়টি।

সঙ্গতটোলার শশাঙ্ক দত্তের বাড়ী।

ঠিক হল, দ্বিতীয় বিনয় বোস প্রথম বিনয় বোসকে নিয়ে আজ রাতে পাশাপাশি সেখানেই থাকবে। সব দায়িত্ব দ্বিতীয় বিনয়ের।

সেদিন রাতে দ্বিতীয় বিনয় কিন্তু চোখের পাতা দুটোকে মুহূর্তের জন্যও এক করতে পারেন নি। তার কাঁধে যে বিরাট দায়িত্ব দেওয়া হল তা হ'তে বিন্দুমাত্র স্খলিত হ'লে তো চলবে না। দায়িত্ব—আর দায়িত্ব।

ইংরেজ শাসকগোষ্ঠির অত্যাচার আরও বেড়েছে।

লোম্যান হত্যাকারী বিনয় বোসকে তাদের চাই-ই চাই।

পুলিশ তার কর্মতৎপরতার প্রমাণ দিল। সারা ঢাকা শহরকে পুলিশের বেড়াজালে ঘিরে রাখল। একটা মাছিও যেন এর ফাঁক দিয়ে গলে যেতে না পারে, গোটা একটা মানুষ তো দূরের কথা।

কিন্তু কোথায় বিনয় বোস?

ক্ষেপে উঠল পুলিশ।

কর্তৃপক্ষের কাছে জাবাবদিহি কোরবার জবাব তাদের জানা নেই।

সুতরাং গ্রেপ্তার হলেন জ্যোতিষ জোয়ারদার, শৈলেন রায়, তেজোময় ঘোষ, মণি সেন, জটু ভাই, রমাপতি মিত্র, ভুপেন সরকার, নেপাল সেন, ভোলা বসাক, জীবন দত্ত প্রমুখেরা।

ওরা নিশ্চয়ই জানেন বিনয় কোথায়?

কিন্তু বিনয়ের সন্ধান সেদিন পুলিশ পায় নি।

ওঁরা যে দেশের জন্য জীবন পণ করে বসে আছেন! ওঁদের কাছ কাছ থেকে বিনয়ের খবর বের করা কি এত সহজ ?

পুলিশ কিন্তু হাল ছাড়ে নি।

ওরা ভেবেছিল, বিনয় ধরা পড়বেই।

ওদের এত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে না।

কিন্তু ওদের সব প্রচেষ্টাই সেদিই ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল।

ওরা পারে নি বিনয়কে ঢাকা শহরে আটকে রাখতে! সাধ্যের অহঙ্কারের- ফাঁকা বুলির মধ্যেই কিন্তু সুড়ঙ্গ কেটে ওরা পালিয়ে গিয়েছিল। বজ্র আঁটুনির ফস্কা গেরোটি ঠিক খুঁজে বের করেছিল সেদিনের বিপ্লবীরা।

প্রকৃতিই সেদিন সাহায্য করছিল ওদের।

সকাল থেকেই বৃষ্টি নেমেছে। বিরাম আর নেই।

এ বৃষ্টি বোধ হয় থামবেও না। রাস্তা পথ-ঘাট জলে জলময়।

তা হোক।

এ বরষাই সেদিন ভরসা দিয়েছিল ওদের।

দুই বিনয় পথে নামলেন।

পোষাক পাল্টে নিয়েছিলেন আগেই! গ্রাম্য মুসলমানের পোষাক। ছেড়া লুঙ্গি আর ময়লা গেঞ্জী দেখে সেদিন কেউ বুঝতে পারে নি, দুজনের একজন ইতিহাসের নায়ক।

কী দুর্জয় সাহস নিয়েই না সেদিন ওরা পথে নেমেছিলেন।

ওঁরা জানতেন। ঢাকা শহর থেকে ওদের সরে যেতেই হ'বে।

লক্ষ্য নারায়ণগঞ্জ।

ঢাকা হ'তে নারায়ণগঞ্জ যেতে হবে রেলপথে। ঢাকা ষ্টেশনে গাড়ী ধরার কোন প্রশ্নই ওঠে না। তাই ওরা বেছে নিয়েছিলেন ঢাকার পরবর্তী রেল ষ্টেশন দোলাইগঞ্জ।

দোলাইগঞ্জ রেল ষ্টেশনে পৌঁছাল গ্রাম্য মুসলমান দুটি।

না, প্লাটফর্মে যাওয়ার অনুমতি আপাততঃ নেই।

ঢাকা থেকে নারায়ণগঞ্জগামী ট্রেনখানা এ ষ্টেশনে তন্ন তন্ন করে খোঁজা হ'বে। ব্রিটিশ পুলিশ আর টিকটিকির দল খবর পেয়েছে, এ গাড়ীতেই বিনয় বোস পালাচ্ছেন।

গাড়ী এসে প্লাটফর্মে দাঁড়াল। পুলিশের হাজার চোখ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখল রেল কামরার ভিতর বাহির সর্বত্র। কিন্তু কোথায় বিনয়।

না, বিনয় বোস আসেন নি।

যাত্রীদের অনুমতি মিলল এবার গাড়ীতে ওঠার।

ছদ্মবেশী দুই বিনয়ের সঙ্গে আরও দুজন গাড়ীতে উঠে বসলেন ব্রজেশ্বর রায় আর বকুল দাশগুপ্ত।

সুপতি রায়ই ওদের পাঠিয়েছন বিনয়কে নারায়ণগঞ্জে পৌঁছে দেওয়ার জন্য।

নারায়ণগঞ্জে ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্র গিরিজা সেনের বাড়িতে তাঁর থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। সুতরাং তাকেও উঠতে হয়েছে।

গাড়ী দুলে উঠল।

প্রাণপণে এক একটা হুঙ্কার ছেড়ে ছুটে চলেছে যন্ত্রদানবটা।

কামরার একপ্রান্তে গ্রাম্য মুসলমান দুটি আর অন্য প্রান্তে রয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল ছেলে।

ওরা হৈ হৈ করে সারা কামরাটা মুখর করে রেখেছে। যেন ছুটির পর ওরা ঘরে ফিরছে। তাই ওরা খুশী।

আসলে কিন্তু দলের নির্দেশেই ওদের যাত্রা।

ওরাও কিন্তু ওদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন।

ওরা জানে, একজন কেউ যাচ্ছে এ গাড়ীতে। কিন্তু কে যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে, কোথায় যাচ্ছে?—সে সব জানবার ওদের কোন আগ্রহ নেই।

ওরা যে ঐ দলেরই সদস্য! ওরা জানে শুধু কাজ করে যেতে হ'বে। কর্মযোগী ওরা। কোন প্রশ্ন, কোন জিজ্ঞাসা অবান্তর।

গাড়ী প্রাণপণে ছুটছে ফতুল্লার দিকে।

সময় এগিয়ে চলেছে।

ভাবছে যাত্রীরা। কতক্ষণ? আরও কত দেরী? আর কতদূর নারায়ণগঞ্জ?

তীব্র হুইশেল দিয়ে গাড়ীটা থেমে গেল।

চাষাড়া ষ্টেশনের প্লাটফর্ম ছুঁয়ে গাড়ী দাঁড়িয়েছে। এখানে এক মিনিটের জন্য গাড়ী দাঁড়াবে। তার পরেই নারায়ণগঞ্জ।

মন তখন ওদের অনেকটা শান্ত। অনেকটা নিশ্চিন্ত। লক্ষ্য আর বেশী দূরে নয়।

গাড়ীটাও এবার চাষাড়া ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে যাবে।

বাইরের দিকে একবার তাকাল ওরা।

উঃ, কী অন্ধকার! ঝড়-জল-বৃষ্টি আজ কি যেন দেখেছে! আকাশের কান্না যেন আর থামবার নয়!

কংসের কারাগার থেকে বসুদেব যখন শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে পথে পা

দিয়েছিলেন তখনও তো এমনই জল-ঝড় সাহায্য করেছিল বসুদেবকে। কৃষ্ণের যে অনেক কাজ—প্রথম কাজ কংস নিধন। সেদিন প্রকৃতি কিন্তু সত্যিই বাঁচিয়েছিল বসুদেবকে।

আর আজকের বিনয়েরও তো অনেক কাজ—ইংরেজ নিধন যজ্ঞের ব্রত উদ্‌যাপনে বিনয়কে যে চাই! প্রকৃতি কী আর নিশ্চুপ থাকতে পারে?

গাড়ীটা দুলে উঠল এবার। চাষাড়া স্টেশন ছেড়ে যাচ্ছে গাড়ী।

কিন্তু হঠাৎ এ কোন্ সঙ্কেত?

বাইরের তীব্র চীৎকার ধ্বনি শুনে ওরা মুহূর্তেই বুঝতে পারল, দলের নির্দেশ ওটা। বিপদ সঙ্কেত ধ্বনি।

সুতরাং দেরী নয়। মুহূর্তের মধ্যে গোটা কামরাটা একেবারে শূন্য হয়ে গেল। সবাই নেমে পেড়েছে।

সামনেই সুপতি রায়। ধন্য সুপতি রায়! ঠিক জায়গা মত ঠিক নির্দেশ দিতে পেরেছেন তিনি। ওরা খবর পেয়েছেন, গাড়ী নারায়ণগঞ্জেও আবার সার্চ করা হবে। তা হোক্। বিপ্লবীরাও গোয়েন্দাগিরিতে কম যায় নাকি? ঠিক সময় বুঝে সুপতি রায় নির্দেশ দিয়ে ওদের সকলকে নামিয়ে এনেছেন গাড়ী থেকে।

গাড়ী ছেড়ে দিতে হল।

তা হোক্, দুঃখ কী? তাঁরা তো জানেন, বিপ্লবী জীবন অতি কঠোর, অতি কঠিন। ঈশ্বরের দয়ায় তাঁরা সবাই যে ওখানে নির্বিঘ্নে পৌঁছে গেছেন সেই তো ঢের।

গাড়ী নাই বা রইল, পা আছে। নারায়ণগঞ্জ এমন আর কী দূর?

ওরা সেদিন পায়ে হেঁটেই নারায়ণগঞ্জ পৌঁছেছিল।

এখানেই বঙ্গেশ্বর রায়, বকুল দাশগুপ্ত আর দ্বিতীয় বিনয় বোস

যিনি দায়িত্ব নিয়েছিলেন সুপতি রায়ের মেস থেকে ছুটি পেয়ে গেলেন।

ওঁরা ওঁদের দায়িত্ব যথাযথ পালন করতে পেরেছেন।

ওঁদের এখান থেকেই ফিরে যেতে হবে ঢাকা। দলপতি সুপতি রায়ের নির্দেশ।

বাকী সবাই আজকের রাতটা গিরিজা সেনের বাড়ীতেই কাটাবে।

সুপতি রায় ভাবছেন: আগামী দিনের কর্মসূচীর কথা। ভাবছেন পথের কথা।

শীতলক্ষা নদীর এ পারে নারায়ণগঞ্জ, ওপারে বন্দর।

বন্দরে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব নিল দলেরই একজন সদস্য মাঝি।

(মাঝি তার ছোট্ট ডিঙি নৌকা নিয়ে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। খদ্দের পাওয়ার আশায়। দুজন গ্রাম্য মুসলমান উঠে বসল ডিঙির উপর। একেবারে মাঝখানে।

মাঝি নৌকা ছেড়ে দিল।

মুখে তার হাসি। লক্ষ্য তার বন্দর। গুন্ গুন্ করে গান গাইতে গাইতে মনের আনন্দে নৌকা ছেড়ে দিল সে।

দৃষ্টি কিন্তু তার চতুর্দিকে সজাগ। বন্দরে তাকে পৌঁছাতেই হবে। (কোমরের নীচে লুকিয়ে রাখা পিস্তলটা আর একবার হাত দিয়ে নেড়ে ও স্থিতিটা জানতে চাইল সে। কাজের সময় যেন বেঁকে না বসে ওটা।/ যেন কাজে লাগাতে পারে ওটাকে।

বন্দর পৌঁছে ওঁরা মাঝিকে বিদায় জানালেন।

একজন বিনয় বোস আর একজন বিপ্লবী সুপতি রায়।

মাঝি হাসল।

তার চোখে মুখে অপার আনন্দ। সে যে পেরেছে ওদের বন্দরে পৌঁছে দিতে।

বন্দর থেকে পায়ে হেঁটে ওরা বৈদ্যের বাজার এলেন। এখান থেকে আবার নৌকা নিতে হ'বে। এবারে কিন্তু আসল মাঝির নৌকা। কারণ মেঘনা পাড়ি দিতে হ'বে যে।

(হ্যাঁ, পোষাক আবার পাল্টে নিলেন ও'রা! একজন জমিদার

আর একজন তাঁরই অনুগত ভৃত্য। একেবারে আলাদা লোক। আগের সেই গ্রাম্য মুসলমানেরা চেহারা নেই।

একেবারে খাস জমিদার চলেছেন হয়তো বহু দিনের অনাদায়ী কর আদায় করতে। তাছাড়া মহাল, কাছারীও অনেক দিন যাওয়া হয় নি। একেবারে না গেলে ভাল দেখায় না।

জমিদার জাঁকিয়ে বসেছেন নৌকার মাঝখানে। মৃদু হাসি তাঁর মুখে।

অনুগত ভৃত্যটি আরও খুশী। সঙ্গ দিচ্ছে সে জমিদার বাবুকে।

মেঘনা। অশান্ত মেঘনা!

সকাল গড়িয়ে গড়িয়ে বিকেলে তার পর রাত্রে পৌঁছাল।

মেঘনার ঢেউ-এর ভাঙাগড়ারও নেই বিরাম। অশান্ত নটিনী, নৃত্য-চপলা যেন।

ঈশান কোণে জমে ওঠা মেঘটা দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়ল সারা আকাশটায়। বৃষ্টি মেশা ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে শুরু হল। মেঘনার বুকে শঙ্কা। মাঝির মুখেও তার প্রতিফলন।

প্রকৃতির খেয়াল ভাল নয়!

অনুমানটা যে মিথ্যে নয়, সেটা প্রমাণ করতেই যেন কোথা হতে ছুটে এল উন্মত্ত ঝড়।

কী যে তার দাপট!

আর তারই সঙ্গে তাল মিলিয়ে নৃত্য পটীয়সী মেঘনার সে কী রুদ্র নাচন! প্রলয়ঙ্করী রূপ মেঘনার। নৌকাগুলো মোচার খোলার মত দুলছে মেঘনার ওঠানামা-ঢেউয়ের তালে তালে।

হতাশ হল মাঝি।

না, সে আর পারবে না। মেঘনা পাড় দেওয়া তার সাধ্যের বাইরে। পয়সার জন্ম সে জীবনটা খোয়াতে রাজী নয়।

জমিদার বাবু আর তাঁর ভৃত্যের মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ।

ভাবছেন সুপতি রায়।

ভাবছেন বিনয় বোস।

এ কী বিপত্তি!

মেঘনা তাদের উপর যেন বিরূপ।

মাঝি শেষ পর্যন্ত পথ বলে দিল।

—ক্যান্ অত ভাববার কি হইছে? জাহাজে চইল্যা যান। সামনেই ফিলেগ্ ইষ্টিশন। একটু বাদেই জাহাজ আইব।

মাঝিই ভরসা। সে চাইল ওদের ফ্ল্যাগ স্টেশনে পৌঁছে দিতে।

তা ছাড়া তো তাদের আর উপায়ও নেই। রাজী না হয়ে আর করবেনই বা কী? একটা ক্ষীণ আশার আলো দেখতে পেলেন ও'রা। ওখানে হয়তো পুলিশ রইবে না।

ফ্ল্যাগ স্টেশনে নেমে মাঝিকে তাড়াতাড়ি বিদায় দিলেন। একবার ভাবলেন দুজনেই। জমিদারবাবু সেজে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে লাভ নেই। পোষাক পাল্টে ও'রা আবার গাঁয়ের মানুষ সাজলেন। দুজন গ্রাম্য মুসলমান। ফ্ল্যাগ স্টেশনে ষ্টিমার এসে পৌঁছাল ঠিক সময়েই। ও'রাও উঠে বসলেন যাত্রীদের ভিড়ে নিজেদের মিলিয়ে দিয়ে।

দামাল কন্যা মেঘনার সব রঙ্গরস মাটি করে দিয়ে ষ্টিমারটা তার বুকের উপর দিয়েই ছুটে চলেছে ঢেউ কেটে কেটে। ভৈরবের দিকে তার গতি।

ভৈরবে পৌঁছে তাঁরা ট্রেনে উঠলেন।

এখন খানিকটা নিশ্চিন্ত।

কিন্তু একেবারে নিশ্চিন্ত হওয়ার জো নেই। সব সময় সব দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়। কোথায়, কোন্ পথ দিয়ে, কখন কোন্ বিপদ আসবে কে বলতে পারে ?

চমকে উঠলেন ওঁরা কিশোরগঞ্জ রেল ষ্টেশনে পৌঁছে।

সারা প্ল্যাটফর্ম পুলিশে গিজ গিজ করছে।

গাড়ী সার্চ করা হবে এখানে।

সর্বনাশ! এখন উপায়!

ভগবান ওঁদের সহায়।

জানালা দিয়ে মুখ বার করতেই ওঁরা দেখলেন একজন টি, টি ওঁদের কামরার কাছে দাঁড়িয়ে চারদিক দেখছেন। যেন একটা মজা দেখছেন।

ওরা তার কাছেই গেলেন। ভেঙে পড়লেন টি, টি-র কাছে। একটা ভুল করে ফেলেছেন তাঁরা। গ্রাম্য মানুষ তাড়াহুড়ো করে গাড়িতে উঠতে গিয়ে আর টিকিট কাটতে পারেন নি। বললেন, তাঁরা কাপড়ের কলে কাজ করতে যাচ্ছেন কোলকাতা। দুটো কোলকাতার টিকিট কেটে দিতে অনুরোধ জানালেন টি, টি-কে।

জলপানি খেতে কিছু ধরেও দিলেন।

আর যায় কোথায় ?

টি. টি. রাজী হলেন। উপরি পাওনার লোভ, সে যে বড় লোভ।

টি. টি-র পেছনে পেছনে ওরা ভাল মানুষের মতই চলে গেলেন টিকিট ঘরের দিকে।

ধোঁকা খেল ব্রিটিশ পুলিশ।

দূর, দূর! কত লোক তো রোজ টি. টি-র সঙ্গে যায়। এরাও হয়তো তেমনই বিনি পয়সার যাত্রী। টি. টি ধরেছে ওদের। টিকিট পায় নি।

গাড়ী সার্চ শেষ হয়ে গেল এরই মধ্যে। ওঁরাও আবার ফিরে এলেন সেই গাড়ীতেই হাসতে হাসতে। যাক ফাঁড়া কেটেছে।

এবারে ময়মনসিং।

গাড়ি ছাড়বার সময় হয়ে এসেছে। ওরা দুজন ছাড়া গাড়ীতে তেমন আর কোন যাত্রী নেই বললেই চলে। সুতরাং আর ভয় নেই।

কিন্তু একেবারে বিনা নোটিশে একজন দারোগা সাহেব কয়েক জন পুলিশ কনষ্টেবল নিয়ে গাড়ীতে উঠলেন। একেবারে শেষ সময়ে।

সুতরাং তখন আর করার কিছু নেই। শুধু যুদ্ধং দেহি ঘোষণা করে সেই বিশেষ মুহূর্তের জন্ম বসে থাকা।

প্রস্তুত বিপ্লবী সুপতি রায়ও।

এই কয়জন পুলিশ আর দারোগার মোকাবিলা তাঁদের করতেই হ'বে। তা না হ'লে শেষ রক্ষা হ'বে না। অপেক্ষা করছেন ওঁরা আঘাতের, তা হলেই প্রতিঘাত শুরু হ'বে।

কিন্তু না, কোন আঘাত এল না।

দারোগা সাহেব খোশ্‌ মেজাজে গল্প জুড়লেন পুলিশ কর্মচারীদের সঙ্গে। তা ছাড়া দারোগা সাহেব হ'লে কী হয়, ভীতুর একশেষ! চাকরি রাখতেই তাকে হুজ্জোত পোয়াতে হচ্ছে। তা না হ'লে এত দৌড় ঝাঁপ তার নাকি ভালো লাগে না।

ওঁরা হাসলেন।

না সে সব কিছু নয়।

বিনয় ততক্ষণে ছেঁড়া কাঁথায় আপাদ-মস্তক ঢেকে কামরার

মেঝেতে শুয়ে পড়েছেন। আর পাশে চুপ চাপ দাঁড়িয়ে আছেন সুপতি রায়। যেন ভীষণ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত তিনি।

দারোগা সাহেবের দৃষ্টি পড়ল ওদের দিকে। তিনি তাকাতেই সুপতি রায় হাত জোড় করে হুজুর সম্বোধন করে একেবারে বিনয়ের অবতার।

দারোগা সাহেব খুশী হলেন এতেই। নিজের পদমর্যাদার ঠাটটুকু বজায় রেখে তাকে হুকুম দিলেন, বোস্ ওখানে।

কাঁথা চাপা দিয়ে একজনকে শুয়ে থাকতে দেখেই দারোগা সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, ওখানে কে শুয়ে ?

এবারে সুপতি রায় করজোড়ে জানালেন, তার চাচাতো ভাই। জ্বরে বেহুঁশ। আল্লা যে কী করবেন, কে জানে ?

গ্রাম্য মুসলমান বেশী সুপতি রায়ের মুখে একথা শুনে দারোগা বাবু লাফিয়ে উঠলেন, সরে গেলেন তিনি অন্য পাশে।

ওঁরাও নিশ্চিন্ত।

রোগীর কাছে ঘেষবে কে ?

গাড়ী এবার জগন্নাথ ঘাট স্টেশনে পৌঁছেছে। এবার ষ্টিমারে চেপে সিরাজগঞ্জ যেতে পারলে আবার ট্রেণ।

জগন্নাথঘাটে দারোগাবাবু দলবল নিয়ে নেমে পড়লেন। এখানেই তাঁর ডিউটি। লক্ষ্য রাখতে হ'বে তাঁকে, বিনয় বোস যেন এ পথ দিয়ে না পালায়।

ধীরে ধীরে নামলেন সুপতি রায়। নামালেন ধরে ধরে বিনয় বোসকে।

সে না জ্বরে বেহুঁশ !

অন্ততঃ সিরাজগঞ্জ অবধি তো সে ভাবেই যেতে হ'বে।

ষ্টিমারে উঠে বসেছেন ওঁরা।

ষ্টিমারে ছুটে চলেছে জল কেটে শুভ্র মরালীর মতই।

তিনদিন ওদের খাবার জোটে নি। খাওয়ার কথা মনে পড়ে নি এ পর্যন্ত।

কিন্তু এখনও তো অনেক পথ বাকী।

কিছু পেটে পড়া চাই।

উপায় খুঁজতে লাগলেন স্বপতি রায়। কী করা যায়। কী করবেন তিনি? না খেয়ে থাকা অভ্যেস বিপ্লবীদের আছে। কারণ ও'রা যে যাত্রা করেছেন দুর্গম পথে ক্ষুরধার সম সূক্ষ্ম! তবু বর্তমানে কিছু খাদ্য চাই। শরীরের বলটাও তো অটুট রাখতে হ'বে।

আর খাওয়ার একমাত্র স্থান এই ষ্টিমার, পরে আবার সে সুযোগ আসবে কিনা কে জানে?

এখানেও একমাত্র ভরসা বাটলার। তাকেই হাত করতে হ'বে। তার আবার প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের নিয়ে করবার। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের দিকে ফিরেও তাকায় না।

পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলেন স্বপতি রায় বাটলারের কেবিনের দিকে। কী যেন বললেন তাকে।

একেবারে ভেলকি বাজী।

মন্ত্রমুগ্ধ বাটলার। বেশ কিছু নগদ ও তার পকেটে আসবে, মন্দ কি?

বিন্দু মাত্র দ্বিরুক্তি করল না বাটলার।

খাবারও পেলেন ওরা।

যাক্ তিনদিন পরে খাবার পড়ল তাহালে পেটে।

ষ্টিমার পৌঁছেছে সিরাজগঞ্জ। এবারে শিয়ালদাগামী ট্রেনে উঠে বসতে পারলেই, ব্যস্। পথ ফুরোতে আর কত দেরী।

এখন শেষ বজায় রইলেই হয়।

পথ অবশেষে ফুরিয়েছিল।

(কোলকাতা পৌঁছতে সক্ষম হ'লেন বিপ্লবী সুপতি রায় বিনয় বোসকে সঙ্গে নিয়ে। মুখে তাঁর তৃপ্তির রেখা।)

বিনয়ের যে অনেক কাজ।

খণ্ড খণ্ড হয়ে মার মুখ চেয়ে এসো কে মরতে পারবে!

সেই ডাকে বিনয় সারা দিয়েছে। ওদের যে লক্ষ্য :

"তোমরা অত্যাচার চালাও—আমরা জবাব দেবো। কোনো ভয়ে ভীত হব না। অত্যাচারের জবাব দেবার মানুষ দেশে আছে—দেশবাসী তা দেখে ভরসা পাবে, আর শাসকগোষ্ঠী তা দেখে ভীত হবে।"

না, লোম্যানকে হত্যা করতে গিয়ে হড্‌সনকে তার অত্যাচারের জবাব দিতে গিয়ে বিনয়ের হাত একবারও কেঁপে ওঠে নি। অব্যর্থ সে নিশানা! গগনচুম্বী তাঁর পরীক্ষা পাশের সাফল্য।

মুহূর্তের মধ্যে সুপতি রায় তার কর্তব্য নির্ধারণ করে নিলেন। কোন ভুলচুক্ করা চলবে না।

বিপ্লবীর পথে নেমে ভুলের ক্ষমা নেই, ভুলের কোন জবাবদিহি চলে না। দলের কাছে তো নয়ই। নিজের মনের কাছেও নয়!

তাই শিয়ালদহ নয়, দমদম জংশনই ভাল।

পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্টের হায়েনা চোখে পড়ে লাভ নেই। টেগার্ট মরতে ভয় পায় না। আশ্চর্য। যেখানে মৃত্যুর আশঙ্কা রয়েছে সেখানেই সে ভয়শূন্য ভাবে পা বাড়ায়। যেন ওতেই ওর আনন্দ।

ওয়ালি উল্লা লেনের সাত নম্বর বাড়ীতে হাজির হলেন স্থপতি রায় বিনয় বোসকে নিয়ে।

এক তলায় মোটর গ্যারেজ। রিক্সা রাখার আস্তানা। ঘিঞ্জি অন্ধকার এই ঘরগুলোতে সারা ভারতের ভিন্ন ভিন্ন জাতির বাস। বাঙালী, বিহারী, পাঞ্জাবী, উৎকল অধিবাসীর সংমিশ্রণ। আর্য-অনার্য, হিন্দু-মুসলমান, সবাই যেন এখানে এক দেহে লীন হয়ে গেছে। নীচ তলাটা বড় প্রাণ চঞ্চল, হৈ হল্লাই যেন এদের জীবনের সব।

কিন্তু দোতলার বাসিন্দারা একেবারে ভিন্ন কোটির জীব। এরা ধীর, এরা শান্ত। হৈ হুল্লোড় এদের জীবনের লক্ষ্য নয়। ঘরখানাও যেমন প্রশস্ত তেমনি সুন্দর ভাবে সাজানো। যেন একটা নয়ন ভুলানো ছবি। এক নিমিষেই অন্তরের সব শ্রদ্ধা লুঠ করে নেয় এখানকার বাসিন্দারা।

এখানে বিনয় পেলেন আন্তরিক সম্বর্দ্ধনা।

না, কোন সভার আয়োজন নয়। সকল কর্মীর অন্তরের প্রীতি স্নেহ বর্ষিত হল বিনয়ের উপর শত সহস্র ধারায়। বিনয় তাদের বড় গর্বের ধন।

ঢাকার গ্রাম্য মুসলমানের পোষাক আর নয়। সেটা ছেড়ে ফেল। ঢাকার গ্রাম্য মুসলমানের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে গেছে এখন।

খাঁটি বার্মীজ মুসলমানের পোশাক পরলেন বিনয়। নিখুঁত সে বেশবাস। কেউ দেখে ভাবতেই পারে না যে ঐ পোষাকের

আড়ালে যে মানুষটি রয়েছেন তিনিই লোম্যান হত্যাকারী দুর্ধর্ষ বিপ্লবী বিনয় বোস।

শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ওয়ালিউল্লা লেন তেমন নিরাপদ বলে মনে হয় নি দলের কর্মীদের। বহু লোকই তো একতলায় আসে। তাদের মধ্যে কেউ যে ছদ্মবেশী টিকিটিকি মহাপ্রভু রইবেন না একথা হলফ করে কেই বা বলতে পারে? তা ছাড়া টেগার্ট কোলকাতার বুকে যিনি সাহসের সঙ্গে, বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সাহায্যে কোলকাতার গুণ্ডাবাহিনীকে ঠাণ্ডা করে বর্তমানে মৃত্যু পাগল তরুণ সম্প্রদায়কে নিয়ে ব্যস্ত তার চোখে অযথা পড়ে লাভ কী?

সশস্ত্র ওরাও, কিন্তু একটা ছেলেমানুষি শপথ নিয়ে অস্ত্রের ব্যবহার করে অযথা ভাবী দিনের কাজের গতিকে শ্লথ করে দেওয়ারও তো কোন যুক্তি নেই।

ওদের লক্ষ্য তো পূরণ হয় নি। ওরা যে সম্মুখের দুস্তর বাধার প্রাচীর ভেঙে ফেলে আঘাত হানতে চায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভিতটিতে। সুতরাং অহেতুক জিদ বাড়িয়ে বিপদ বরণ করে নেওয়া নিরর্থক।

না, বিনয় বোসকে ওয়ালিউল্লা লেনে রাখা ঠিক নিরাপদ নয়।

আবার প্রশ্ন উঠল, সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর ব্যূহ ভেদ করে কি ভাবে বিনয়কে কাতরাসগড় কলিয়ারীতে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব? তা ছাড়া একথাও তো সত্য যে তার ছবি সর্বত্র টাঙানো রয়েছে

আর দেশের সবলোকই এখনই দেশাত্ম-বোধের উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত হয়েও ওঠেনি।

তবু বিপ্লবীদের অভিধানে অসম্ভব বলে কিছু নেই। থাকতে পারে না। অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলাই যে তাদের ব্রত। সুতরাং পরাজয় ওরা স্বীকার করবে না। হারবে না ওরা কোন কিছুতেই।

এগিয়ে এলেন একজন প্রাচীন নেতা। তিনি দায়িত্ব নিলেন বিনয় বোসকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার।

হ্যাঁ, এঁর উপর দলের সব কর্মীদের অগাধ বিশ্বাস। ইনি ঐতিহাসিক রডা অস্ত্রলুণ্ঠনের অন্যতম বিপ্লবী নায়ক—হরিদাস দত্ত। বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স কর্মীদের মেজদা।

হরিদাস দত্ত অবশ্য সাহায্য নিলেন তাঁরই ভাগ্নি জামাই সরোজ রায়ের। সরোজ রায় হুগলী জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কনফিডেন্সিয়াল ক্লার্ক। হরিদাস দত্ত বিনয় বোসকে নিয়ে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রাইভেট গাড়ীতে করেই ব্যাণ্ডেল জংশনে এলেন। সঙ্গে সরোজ রায়।

ষ্টেশনে পাহারা দিচ্ছে পুলিশ বাহিনী। কোলকাতা হতে বহির্গামী সব ট্রেনে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হচ্ছে ঃ বিনয় বোস যেন কোন রকমেই পালিয়ে যেতে না পারেন। ঢাকায় মরিয়া হয়ে পুলিশ বাহিনী বিনয়কে খুজেছে, চালিয়েছে পুলিশী অত্যাচার ; কিন্তু বিনয় বোসকে খুজে পায় নি। ব্রিটিশ পুলিশ জেনেছে বিনয় ঢাকায় নেই, কোলকাতা পালিয়ে গেছেন। সর্বত্র তাঁর ছবি ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। সম্ভাব্য সব স্থানেই পুলিশ হানাও দিয়েছে। অত্যাচারে নিষ্পেশনে ঢাকার মানুষ সেদিন জর্জরিত

হয়ে পড়েছিল কিন্তু বিনয়কে খুঁজে পায়নি ব্রিটিশ পুলিশ। কী লজ্জা! কী লজ্জা! ব্যর্থতার এই গ্লানি ঢাকতেই যেন ওরা এখন আরও বেশী সাবধানী, আরও বেশী মরিয়া।

ওদের ভাষায় ডেঞ্জারাস ছেলে বিনয় বোস পালিয়ে গেলেন কোলকাতা থেকে পুলিশকে কলা দেখিয়ে।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের প্রাইভেট গাড়ীতে কনফিডেন্সিয়াল ক্লার্ক সরোজবাবুর সঙ্গে যে তুজন ভদ্রলোক বসে আছেন তাঁরা নিশ্চয়ই সরোজবাবুরই কোন আত্মীয়। সুতরাং ওদিকে নজর দিয়ে দশ-হাজার টাকার পুরস্কারটা ডিউটিরত পুলিশ কর্মীরা মাঠে মারা যেতে দিতে রাজী নয়। কারণ ওতে শুধু সময় আর সুযোগই নষ্ট হবে। তাই সরোজবাবুকে একটা করে সেলাম ঠুকে দিয়েই ওরা ওদের কর্ম্মতৎপরতা এবং ব্যস্ততা স্বয়ং সরোজবাবুকে দেখাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল। আর বিনয় বোস কোলকাতা হতে সহজেই চলে এলেন ব্যাণ্ডেল হয়ে কাতরাসগড় কোলিয়ারীতে। দলীয় বন্ধু অনাথবন্ধু দাসের কোয়ার্টারেই থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল বিনয়ের।

বিনয় বোস সেখানেই ছিলেন। চুপচাপ গা ঢাকা দিয়ে বসে থাকতে তাঁর খুব বেশীদিন ভাল লাগল না। হাঁপিয়ে উঠলেন তিনি। মনও সায় দিল না। তিনি কাজ চান। খাঁটি কর্ম্মযোগী তিনি। তাই কর্মযজ্ঞের আয়োজন থেকে তিনি তাঁর কর্মি মনটিকে কিছুতেই সরিয়ে রাখতে পারছিলেন না।

কাতরাসগড় কোলিয়ারীর অনাথবন্ধুর বাসা ছেড়ে আবার কোলকাতা চলে এলেন। এবার প্রথম কয়েকদিন সাতনম্বর ওয়ালিউল্লা লেনে তিনি থাকলেন। তারপর চলে গেলেন বেলে-ঘাটায়। জায়গাটা নিরিবিলি এবং নিরাপদও।

কিন্তু এই নিরাপদ আর নিরিবিলি আশ্রয়টিও সন্ধান পেয়েছিল ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগ।

একদিন গভীর রাতে একজন নেতা এসে উপস্থিত হলেন। দায়িত্বশীলতার তুলনা নেই এর। তিনি জানালেন, আর মুহূর্ত মাত্র বিলম্ব নয়। এক্ষুণি, এই মুহূর্তেই আমাদের সকলকে সরে পড়তে হবে অন্য কোথাও।

অবাক হলেন বেলেঘাটার আস্তানায় অবস্থানকারী পার্টির কর্মিরা। অবাক হলেন বিনয় বোস। কী ব্যাপার! এ স্থান তো খুবই নিরাপদ। পুলিশের যাতায়াত নেই বললেই চলে।

কিন্তু কোন ওজর আপত্তি শোনেন নি নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিটি। তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন, গেট্ আপ! কুইক! কোন কথা নয়। আমাদের এ স্থান ছেড়ে চলে যেতেই হবে।

আশ্চর্য, ঠিক আধঘণ্টা পরেই পুলিশ বাহিনী রেইড কোরল সেই বাড়ীটা। বাড়ীটার চতুর্দিকে ব্রিটিশ পুলিশ গিস গিস করছে। আর সেই পুলিশ বাহিনীকে পরিচালনা করে নিয়ে এলেন স্বয়ং চার্লস টেগার্ট।

কিন্তু সব বৃথা! শূন্যঘর! কেউ কোথাও নেই। শুধু ঐ শূন্য ঘরটাই রয়েছে আর কোন চিহ্ন পর্যন্ত নেই। শূন্য ঘরটা মুখ হাঁ করে চার্লস টেগার্টকে জানাচ্ছে: তুমি যতই সেয়ানা হও না কেন, আমরা বিপ্লবীরা আরও বেশী সেয়ানা। তোমরা যখন ডালে ডালে ঘুরে বেড়াও আমরা তখন থাকি পাতায় পাতায়। আর সেই পাতার সন্ধান পেলে আমরা আরও এককাঠি এগিয়ে যাই, একেবারে শিরায় শিরায়।

বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স নেতারা একটি বিশেষ জরুরী বৈঠকে সমবেত হলেন। এই দলের সর্বাধিনায়ক শ্রদ্ধেয় হেমচন্দ্র ঘোষ। কার্যকরী সংসদে রয়েছেন হরিদাস দত্ত, সত্য বক্সী, মেজর সত্য গুপ্ত ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়, রসময় শূর, প্রফুল্ল দত্ত ও মনীন্দ্র রায়। এ্যাকশন স্কোয়াডে থাকতেন হরিদাস দত্ত, রসময় শূর, প্রফুল্ল দত্ত, সুপতি রায়, নিকুঞ্জ সেন।

সকলের সামনে এখন একটি মাত্র প্রশ্ন : বিনয় বোসের নিরাপত্তার কী ব্যবস্থা করা যায়। বিপ্লবীদের প্রাণের মায়া মমতা নেই, কিন্তু দেশমাতৃকার পরাধীনতা মোচনের জন্য যে সকল ইস্পাত-তরুণের প্রয়োজন তাদেরই একজন অন্যতম বিনয় বোস। তাঁকে অত সহজে ব্রিটিশ শ্বাপদের মুখে দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

ওঁরা সবাই ভাবছেন। (পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহাবিপ্লবী সুভাষচন্দ্রও ভাবছেন এই একই ভাবনা।) শেষ পর্যন্ত সুভাষ বোস তাঁর মতামত জানালেন,) বিনয়কে বিদেশে পাঠিয়ে দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। পুলিশের দৃষ্টি এড়িয়ে এড়িয়ে দীর্ঘকাল থাকা সম্ভবও নয়। হয়তো বা তাকে ধরা পড়তে হবে। তার চেয়ে বর্তমানে সরে যাওয়াই ভাল।

শ্রদ্ধেয় শরৎচন্দ্র বোসও সেই কথাই বললেন।

তাহলে আর কেন। বাঙালীর গর্বের ধনটিকে অকালে খোয়ানো যেতে পারে না।

কিন্তু আর একটা প্রশ্ন উঠল, টাকা! বিদেশে যেতে হলে তো টাকাও লাগবে প্রচুর।

টাকারও ব্যবস্থা হল। আচার্য স্যার পি: সি. রায় দিলেন পাঁচশো টাকা! লেডি অবলা বসুও দুশো টাকা।

পাথেয় সংগ্রহ করতে বেগ পেতে হল না ওদের। এবারেও এগিয়ে এলেন হরিদাস দত্ত। একদিন তিনিই বিনয়কে ব্যাণ্ডেল জংশন পার করে কাতরাসগড় কোলিয়ারিতে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তিনি যে অসাধ্য সাধনের যাদুকর! যাদুকরটি তাই একদিন কিংস জর্জ ডংকর মিঃ মিলকে বশ করে ফেললেন অত্যন্ত অনায়াসে।

আগামী কাল ভোর পাঁচটায় একটা জাহাজ ছাড়বে। সেই জাহাজেই বিনয়কে পাড়ি দিতে হবে। এখান থেকে সোজা ইটালী। তারপর আর পায় কে?

হরিদাসবাবু একেবারে পাকা ব্যবস্থা করে ফিরে এলেন।

শেষ পর্যন্ত এই পাকা ব্যবস্থার আর প্রয়োজন পড়ল না। কারণ বিনয় নিজেই গররাজি হয়ে পরিকল্পনা ভেস্তে দিলেন।

আসলে তখন বিনয় ঠিক করে নিয়েছেন মনে প্রাণে, যে করেই হোক তিনি বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের পরবর্তী অভিযান ব্রিটিশ শক্তির বিশেষ ঘাঁটি রাইটার্স বিল্ডিং আক্রমণে অংশ গ্রহণ করবেনই। যে কোন মূল্যের বিনিময়েই হোক্ না কেন।

তাই তো ইটালী পালিয়ে গা ঢাকা দিতে রাজী হলেন না বিনয়! উচ্চকণ্ঠে তিনি ঘোষণা করলেন দলের কর্মীদের কাছে, বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের এ অভিযানে তিনি যাবেনই।

ওঁদের আস্থা আছে বিনয়ের উপর। সুতরাং কোন প্রশ্ন নয়, সংশয় বা দ্বিধা নয়। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা মেনে নিলেন সে দাবী।

ঠিক হল এ অভিযানে অধিনায়ক হবেন স্বয়ং বিনয় বোস।

আর সাহায্যকারী হিসেবে যে দু'জন তাকে সাহায্য করবেন তাঁরা বাদল ও দীনেশ।

কিন্তু আর পলাতক জীবন নয়। আজ বিনয় বোসকে পেতে হবে এমন একটি আশ্রয়—যেখানে প্রতিবেশীদের সন্দেহ-কুটিল মনের অসূয়া স্পর্শ পৌঁছাবে না, পৌঁছাবে না ব্রিটিশ গোয়েন্দা পুলিশের হায়েনা চোখের হিংস্র লোলুপ দৃষ্টি। অভিযানের তারিখটি পর্যন্ত একটু নিশ্চিন্ততা, একটু শান্তি দরকার তাঁর জীবনে। মানসিক প্রস্তুতিপর্বে পলাতক জীবন হতে একটুখানি স্থিতি হওয়া দরকার।

এগিয়ে এলেন একনিষ্ঠ কর্মী রাজেন গুহ।

তিনি সানন্দে রাজী হলেন তাঁর পরিবারেরই একজন হিসেবে বিনয়কে স্থান দিতে। বিনয় স্থান পেলেন মেটিয়া বুরুজের রাজেন গুহর বাড়ীতে। একেবারে অন্দর মহলের আনন্দ-মহলে।

এ মহলের বাসিন্দা রাজেনবাবুর স্ত্রী ও দুটি শিশু-পুত্র। বিনয় এ ছেলে দুটির সঙ্গে ভাব করে নিলেন খুব তাড়াতাড়ি। ছেলে দুটি হয়ে উঠল বিনয়ের ভীষণ ন্যাওটা। বিনয় তার পলাতক যাযাবর জীবনের অবসানে এই যে ক্ষণস্থায়ী ঘরটী পেলেন তা হলই বা স্বল্পকালের জন্য, কিন্তু তা যে তাঁর জীবনে একটি বিরাট মূল্য ধরে এখানে এসেই তো বিনয় পেলেন রাজেনবাবুর স্ত্রী, তাঁর বৌদির স্নেহ—যে অনাবিল স্নেহধারার সিক্ত হতে হতে এক সময় বিনয় বোসের মনে হয়েছিল তাঁর এই বৌদি আর তাঁর গর্ভধারিণী জননীর মধ্যে কোন ভেদ নেই। ধন্য হয়েছিলেন এই মহিলাটির সান্নিধ্য পেয়ে।

ক্যাপটেন দীনেশ।

দীনেশ গুপ্ত।

বিক্রমপুরের যশোলঙ্গ গ্রামের সতীশ গুপ্তের সুসন্তান দীনেশ গুপ্ত উনিশ শ' এগার সালের ৬ই ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

মাত্র উনিশ বছর বয়সেই দীনেশ গুপ্ত রচনা করলেন অগ্নিযুগের একটা সম্পূর্ণ ইতিহাস।

কবি, শিল্পী ও দার্শনিক দীনেশ বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের দুঃসাহসী সৈনিক। তুলনাহীন সংগঠন শক্তির অধিকারী ছিলেন তিনি। এই সংগঠন শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন দীনেশ ঢাকায়, দিয়েছিলেন মেদিনীপুরে।

উনিশ শ' তিরিশের অসহযোগ আন্দোলন। বিদেশী জিনিস বয়কট করে জনগণকে আন্দোলনের সামিল হওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন পিকেটররা। বিদেশী জিনিস কেনা মানেই তো দেশের টাকা বিদেশে পাঠিয়ে দেওয়া, অত্যাচারী বিদেশী শাসকের সহযোগিতা করা। না, তা কোনক্রমেই সম্ভব নয়।

ঢাকার রায় কোম্পানীর বিলাতী মদের দোকানের সামনে পিকেটররা সমবেত হয়েছেন সেদিন। জোর পিকেটিং চলছে। বিলিতি মদ কেনা চলবে না। পিকেটররা শুধু ক্রেতাদের অনুরোধ জানিয়েছিলেন। বল প্রয়োগ করার চেষ্টা করেন নি।

কুখ্যাত পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এই পিকেটরগুলোকে দমন করার জন্য পুলিশ বাহিনী নিয়ে হাজির।

ভ্রুক্ষেপ নেই পিকেটরদের।

দেশ-প্রেম তখন ওদের চোখে মুখে সোচ্চার। ওরা চীৎকার করছে সামনে, বিলিতি জিনিষ বয়কট করুন। দেশকে অর্থ নৈতিক দিক দিয়ে দুর্বল করবেন না। আপনাদের কাছে আমাদের বিনীত অনুরোধ, দেশের কথা ভাবুন। শোষক ইংরেজ সম্প্রদায়ের সহযোগিতা করার মানেই নিজেদের কবর খোঁড়া। নিজেদের মৃত্যু-বাণ নিজের হাতে তুলে নিতে কিছু সংখ্যক ক্রেতার মনে দ্বিধা এসেছিল সেদিন!

মিঃ হড্‌শনের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গিয়েছিল সেই মুহূর্তে।

পিকেটরদের মধ্যে আজ অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী। একজন ছাত্রের হাত ধরে হড্‌শন মারতে উদ্যত হয়েছেন। চোখে মুখে তার দাবানল। রুদ্ররোষ।

ঠিক সেই সময়েই দীনেশ সেই পথ ধরেই যাচ্ছিলেন। তাঁর নিজস্ব যান সাইকেলে চেপেই। নেমে দাঁড়ালেন। তারপর গর্জে উঠলেন ইংরাজীতে :

থামুন! ওকে মারবার আপনার কোন এক্তিয়ার নেই।

দীনেশের কণ্ঠস্বরে ঘুরে দাড়িয়েছিলেন হড্‌শন। কালা আদমীর মুখে এতবড় কথা মানায় না। তার উপরে তার মুখের সামনে এত বড় কথা! বড্ড সাহস দেখছি! গর্জন করে উঠলেন তিনি : হোয়াট্‌!

হ্যাঁ, ওকে মারবার কোন অধিকার নেই।

কী অপমান! কী অপমান! লজ্জায় লাল মুখ নিয়ে হড্‌শন এবার খিঁচড়ে উঠলেন।

সরে দাড়াও, না হ'লে গুলি কোরব।

কোমরে গুজে রাখা রিভলভারখানা খাপ থেকে তুলে নেন হড্‌শন। আর সঙ্গে সঙ্গে সাইকেল রেখে বুক পেতে দাঁড়ালেন দীনেশ।

বেশ, গুলি কর, এক্ষুণি। যদি কাপুরুষ না হও এক্ষুণি গুলি করবে।

অবাক হয়েছিলেন হড্‌শন।

অবাক হয়েছিল সেদিন সমস্ত ঢাকা শহর।

ধন্যি ছেলে দীনেশ। তিনি হয়তো ভাঙবেন কিন্তু মচকাবেন না। এমন জাত কেউটেরই তো সেদিন প্রয়োজন ছিল দেশের।

হডশন ফিরে গিয়েছিলেন। তাছাড়া তার উপায় ছিলনা সেদিন।

অনেক দারোগা পুলিশকেই তো তার পর সরে দাঁড়াতে হয়েছে দীনেশের পথ থেকে। দীনেশের কঠোর মনোবল আর ইচ্ছাশক্তির সামনে ব্রিটিশ পোষ্য অনেক বাঘা বাঘা দারোগাই সেদিন নাজেহাল হয়ে পড়েছিলেন।

ঢাকা জিলার বিক্রমপুরের একটা বাজারের কাছ দিয়ে বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সে কয়েকজন ছেলে মার্চ করে চলেছে। তাদের মধ্যে দীনেশও আছেন। সেদিন নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ঢাকা জিলার বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স বাহিনীর অফিসার কমাণ্ডিং জ্যোতিষ জোয়ারদার।

বাজারের কাছাকাছি পৌঁছাতেই বিপত্তি।

একটা সোরগোল উঠল—ডাকাত পড়েছে বাজারে। মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত দোকানপাট বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

এই বিপ্লবীরা তখন ব্রিটিশের কাছে জুজুর ভূমিকা নিয়েছে। আর দেশের ব্যবসায়ী মহলে এরা স্বদেশী ডাকাত বই অন্য কিছু নয়।

পাশেই বিক্রমপুর থানা। ছুটে এলো সেপাই-পান্ত্রী! সাধারণের নিরাপত্তা বজায় রাখতেই সেদিন এসেছিল ওরা।

হতভম্ব জোয়ারদার।

অবাক দীনেশ।

চারপাশের অস্ত্রধারী পুলিশদের দেখেই ব্যাপারটা অনুমান করতে দীনেশের দেরী হয় নি। তিনি এগিয়ে গেলেন দলের সামনে আর সবাই রইল তাঁর পেছনে। বিস্ময় বিহ্বল চোখে তাকিয়ে দীনেশ দারোগাবাবুকে শুধালেন কি ব্যাপার বলুন ত?

আমরা খবর পেয়েছি বিক্রমপুর বাজারে ডাকাত পড়েছে।

দারোগাদাবুর মুখ থেকে একথা শুনে প্রত্যুৎপন্নমতি দীনেশ হেসে উঠলেন সশব্দে। বললেন সে কী কথা বলছেন? ডাকাতি করতে আমরা খালি হাতে আসতে পারি? তেমন কিছু লক্ষণ দেখছেন কী?

না তো। দারোগাবাবু কেমন যেন বিমূঢ়। লজ্জা পেলেন তিনি।

কিন্তু দীনেশ সেদিন দারোগাবাবুকে সহজে ছেড়ে দিলেন না। কাছের একটা ময়রার দোকানে গিয়ে সব মিষ্টি, সিঙ্গাড়া সবাই মিলে সাবার করে দিয়ে দাম মেটানোর দায়টা দারেগোবাবুর কাঁধে চাপিয়ে দিলেন। দারোগাবাবুরও সেদিন না বলবার কোনো উপায় ছিল না। দীনেশ একে তো নাছোড়বান্দা ছেলে, তার উপরে সেদিন দারোগা-বাবুকে দাদা বলে ডেকে তার কোয়ার্টারে বৌদির কাছে খাওয়া করতে চেয়েছিলেন যে!

দারোগাবাবু বুঝেছিলেন এর হাত থেকে সহজে রেহাই পাওয়া যাবে না। তাই কিছু নিজের পকেটের টাকা সেদিন তাকে খেসারৎ দিতেই হয়েছিল। এ ছাড়া উপায়ও ছিল না।

দীনেশের ব্যবহারে সেদিন দারোগাবাবু মন্ত্র-মুগ্ধ হয়েছিলেন।

সংসারে সবাই তার আপন জন। কেউ বা দাদা, কেউ বা বৌদি—আবার মামীমা, পিসিমা, খুড়ীমার দলেরও অভাব নেই। এরা সবাই দীনেশকে ভালবাসত। আসলে ভালবাসা আদায় করে নিতেন দীনেশ নিজেই। তাঁর কর্তব্য-বোধ ছিল অত্যন্ত সজাগ।

কর্তব্য–চ্যুতি বা কর্তব্যে অবহেলা দীনেশের অভিধানে ছিল না। কেউ কাজে ফাঁকি দিয়ে যেমন কোন দিনই তাঁর কাছ থেকে ক্ষমা পায় নি, তেমনি নিজেও সামান্যতম ফাঁকিও কোনদিন দেন নি। যে

কোন রকম অসুবিধা বা বাঁধা অতিক্রম করার মত নিজের মনোবল ছিল অত্যন্ত দৃঢ়।

ভোর রাত্রে একদিন তাঁকে পল্টন মাঠে যেতে হবে। তিনি জানেন জন কয়েক ছেলের সেখানে আসার কথা। তাদের তৈরী করার দায় আর দায়িত্ব দুই–ই দীনেশের উপর এসে বর্তেছে।

রাত যখন প্রায় তিনটে তখন তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। উঠে পড়লেন তিনি। তাড়াতাড়ি পোষাক পাল্টে যখন প্রস্তুত হলেন বের হওয়ার জন্য তখন মিনিট পাঁচেক সময় হাতে আছে।

দীনেশ তখন উয়ারীর বাসায় থাকেন। সেখান থেকে পল্টন মাঠের দূরত্বও বেশ। প্রায় মাইল দেড়েক—সাইকেলে এটুকু রাস্তা বিশেষতঃ রাত্রের জনবিরল রাস্তা পার হতে খুব বেশী সময়ও লাগবে না। সুতরাং দীনেশ নিশ্চিন্ত।

কিন্তু হঠাৎ সাইকেলে হাত দিয়েই তাঁর মাথা বন্‌বন্‌ করে ঘূরে গেল। সাইকেলের চাকার বায়ুশূন্য অবস্থা দেখে তিনি হাথায় হাত দিয়ে বসলেন। তাহলে উপায়! ছিঃ ছিঃ, ঘুমোবার আগে অন্ততঃ সাইকেলটা তাঁর দেখে নেওয়া উচিত ছিল।

যে ভুল তিনি করেছেন তা তো আর ফেরানো যাবে না! সুতরাং সে নিয়ে বেশী ভেবে লাভ কি?

মন স্থির করে নিলেন দীনেশ।

কথা তাঁকে রাখতেই হবে। তা হতে একচুলও এদিক ওদিক করলে চলবে না। সুতরাং রাস্তায় নেমেই তিনি ছুটতে লাগলেন! দৌড়—দৌড়। কর্তব্য-বোধের চাবুকটা তাঁকে তাড়িয়ে নিয়ে চলল। দুরন্ত বেগে।

অবশ্য দু-দশ মিনিট দেরী হলেও এমন কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেতো না। কারণ সেদিনের যারা শিক্ষার্থী তারা নিশ্চয়ই দীনেশের জন্য অপেক্ষা করত। কিন্তু দীনেশ তা চান নি। তিনি

নিজে যদি সময়ের মূল্য রাখতে না পারেন, তাহলে অন্যের কাছ থেকে সময়ের মূল্যবোধ তিনি আশা করতে পারেন না। তাই নিজের ভুলের মাশুল দিতেই তাঁকে দৌড় প্রতিযোগিতা করতে হয়েছিল।

ঠিক সময়েই পৌঁছেছিলেন তিনি।

তিনি যে মনে-প্রাণে শুনেছিলেন।

এ আহ্বান উনিশ শ' তিরিশের বাংলার সর্বত্র।

সর্বত্র নতুন দিনের সঙ্কেতে রৌদ্র ঝলমল।

অত্যাচার আমরা সয়েছি। মার আমরা খেয়েছি। এবারে বদলা নেওয়ার পালা। সর্বত্র শুধু তারই প্রস্তুতি আর প্রতিধ্বনি।

আর সেই প্রস্তুতি পর্বেই দীনেশ যে কোনরকম মূল্যে নিজের সমস্ত ক্ষমতা, নিজের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করার শপথ নিয়েছিলেন।

তাই যেদিন তাঁর কাছে দলের নির্দেশ পৌঁছেছিল মেদিনীপুরে যাওয়ার জন্য, ওখানকার যুবকদের সংঘবদ্ধ করার ভার এসে পড়েছিল দীনেশের উপর, সেদিন দীনেশের মনে কোন প্রশ্নের ঝড় ওঠে নি। কোন দ্বিধা দেখা দেয় নি।

সঙ্গে সঙ্গে ঢাকার পড়াশুনায় ইস্তাফা দিলেন। পাততাড়ি গুঠালেন ঢাকা থেকে। মেদিনীপুরে এলেন তিনি। ভর্তি হলেন সেখানকার কলেজে। ব্যক্তিগত সুবিধা অসুবিধার কথা ভাববার অবসর নেই দীনেশের। তিনি যে শুনেছেন দলের নির্দেশ—বাধা-বিপত্তির প্রাচীর ডিঙিয়ে তাকে এগিয়ে যেতেই হবে সুমুখপানে। আপন লক্ষ্য হতে তিনি ভ্রষ্ট হতে পারেন না।

কাজ পাগল দীনেশের নতুন পরিবেশ আর নতুন মানুষ পেয়ে সংগঠন কাজে মত্ত হয়ে উঠলেন। আশাতীত সাফল্যও পেলেন।

জেগে উঠল মেদিনীপুর।

দীনেশ এখানকার তরুণদের কানে কানে যে মন্ত্র শোনালেন সেই মায়া মন্ত্রে ওদের জড়তা কেটে গেল। অহল্যা–পাষানে প্রাণের স্পন্দন ফুটে উঠল-এ প্রান শুধু কাজ চায় অন্য কিছু নয়।

দীনেশ খুশী হয়েছিলেন। নিজেকে ধন্য মনে করেছিলেন। কারণ দলের নির্দেশ তিনি পালন করতে পেরেছেন অক্ষরে অক্ষরে।

কিন্তু মেদিনীপুরে আর নয়।

আবার নির্দেশ, আবার ঢাকায় ফিরে আসতে হবে।

দীনেশ কিন্তু নির্বিকার। কোনো ক্ষোভ নেই। নিজের ব্যক্তিগত সুখ সুবিধার কথা ভাববার অবসরও তাঁর নেই। আগে দল তারপর অন্য কিছু। সুতরাং মেদিনিপুরের মায়া পরিত্যাগ করতে হবে। দীনেশ তাই করলে। দায়িত্ব বুঝিয়ে দিলেন দলের সুযোগ্য সহকর্মির হাতে। ফিরে গেলেন তিনি ঢাকায়।

দীনেশ যে সাধারণ ছেলে নয়।

বেঙ্গল ভলা ণ্টিয়ার্স দলের ইস্পাত কঠিন সৈনিক দীনেশ। ভয় তাঁর অভিধানে ছিল না ছিল না ব্রিটিশের কোন আইন কানুনের প্রতি ভ্রূক্ষেপ।

অসহযোগ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ তখন সভা-সমিতি, মিছিল বে-আইনী ঘোষণা করেছে। কিন্তু তাতেও ভ্রুক্ষেপ নেই দীনেশের। ২৬শে জানুয়ারী। একটি মিছিলের নেতৃত্ব নিয়ে দীনেশ এগিয়ে চলেছেন। ঢাকা সদর ঘাট থেকে নারান্দার দিকে যাওয়াই তার লক্ষ্য ছিল সেদিন।

সদর ঘাট চৌমাথার মোড়ে পৌঁছাতেই বাধা পেলেন দীনেশ।

বাধা দিল একজন হাবিলদার, মিছিল বন্ধ করতে হবে। মিছিল নিয়ে আর এগিয়ে যেতে দিতে রাজী নয় হাবিলদারটি।

কিন্তু দীনেশও ছাড়বেন না। মিছিল তিনি নিয়ে যাবেনই। নাছোড়বান্দা দীনেশ এগিয়ে গেলেন।

ব্রিটিশ পুলিশ কস্টেবল বা হাবিলদার এরা তখন মূর্তিমান বিভীষিকা—মৃত্যুদূত সদৃশ।

হাবিলদার দীনেশকে দলপতি ভেবে নির্দেশ দিল, জলদি মিছিল হটাও।

কিন্তু কে কাকে হটায়!

দীনেশ কাছাকাছি এগিয়ে এসে খপ করে হাবিলদারের কোমরের বেল্ট চেপে ধরে মিছিলে সেদিন যাঁরা অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের সকলকে এগিয়ে যেতে বললেন।

ঐ হাবিলদারের মহড়া নেওয়ার ক্ষমতা দীনেশের ছিল।

সেদিন অসাধ্য সাধন করলেন দীনেশ।

এই অসাধ্য সাধন করতেই ডাক এল এবার কোলকাতা হতে।

দীনেশ সে ডাকে সাড়া দিলেন।

অন্তর যে তাঁর নব চেতনায় উদ্বুদ্ধ। তিনি যে উপলব্ধি করেছেন অন্তরে অন্তরে, দেশের মানুষের হয়ে জবাব দেওয়ার তিনিও একজন সৈনিক। স্বাধীনতা ভিক্ষা দ্বারা মেলে না। স্বাধীনতা অর্জন কালে হয়তো কিছু দেশের তরুন শক্তির খেসারতের প্রয়োজন দেখা দেবে দিলই বা! তাতে ভয় পান না দীনেশ।

নির্ভীক সৈনিক দীনেশ তাই ঢাকা হতে কোলকাতায় এলেন।

মেজর বিনয় বোসকে ক্যাপ্টেন দীনেশ গুপ্ত সাহায্য করবেন রাইটার্স বিলডিং অভিযানে।

V.V (পার্ক স্ট্রিট।

ডাঃ অনিমেষ রায় ও ডাঃ হিমাংশু ব্যানার্জীর চেম্বার। তাঁদের একতলায়। এরাও দলীয় সদস্য।

দোতলায় বাঘা বাঘা বিপ্লবীদের আস্তানা। অ্যাকসন স্কোয়াডের কর্মী নিকুঞ্জ সেন, সুপতি রায় এখানেই রয়েছেন। আত্মগোপন করে রইবার মত এমন আস্তানা আর খুব বেশী নেই।

এখানেই স্থান পেলেন দীনেশ। সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে অস্বীকার করা চলে না।

প্রস্তুতিপর্বে সব কিছু কাঁচিয়ে লাভ নেই।

আর একজন স্থান পেয়েছিলেন এই আশ্রয়ে।
তিনি লেফটেন্যান্ট বাদল।
বাদল গুপ্ত।

বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের এ্যাকসন স্কোয়াডের অন্যতম সদস্য। নিকুঞ্জ সেনের হাতে গড়া ছাত্র বাদল। উপযুক্ত শিক্ষকের মর্যাদা বাদল রেখেছেন উপযুক্ত এবং যোগ্য ছাত্র হিসেবেই।

আসল নাম সুধীর গুপ্ত। অবনী গুপ্তের সুসন্তান তিনি। ঢাকা বিক্রমপুরের বিদ গাঁও গ্রামে তাঁর বাড়ী।

বিনয় বাদল দীনেশ—এ তিন জনের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ বাদল। মাত্র আঠারো বছরের তরুন বাদল জীবনের একমাত্র লক্ষ করেছিলেন কাজ।

কোন প্রশ্ন নয়, কোন কথা নয়—শুধু নীরব কাজই করে গিয়েছেন তিনি।

উনিশ'শ উনত্রিশ সালের কথা।

নিকুঞ্জ সেন তখন বিক্রমপুর বানরী স্কুলে শিক্ষকতা করেন। বাদল স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হওয়ার মন্ত্র পেলেন এই শিক্ষকের কাছ থেকেই।

কংগ্রেসের উচু মহল থেকে ঢাকায় নির্দেশ এল : বাংলার নতুন দিনের সঙ্কেত মুহূর্তে ওদের সহযোগিতার প্রয়োজন। অবিলম্বে পালনীয় নির্দেশনামা এসে পৌঁছেছে, টেলিগ্রাম টেলিফোনের তার কাটতে হ'বে। সম্ভাব্য জায়গায় রেললাইন উপড়ে ফেলতে হ'বে।

একনিষ্ঠ সৈনিক বাদলের ডাক পড়ল।

বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের কর্মকর্তারা বুঝিয়ে দিলেন, বাদলকে কি করতে হ'বে।

তৎপর হয়ে উঠলেন বাদল।

এ যে দলীয় নির্দেশ!

সুতরাং কোন প্রশ্ন নয়—শুধু কাজ।

বাদলকে নির্দেশ দিয়ে ওঁরা একরকম নিশ্চিন্তই ছিলেন। জানতেন নিকুঞ্জ সেনের হাতে গড়া ছেলে কোন ভুল চুক করে না।

করেনও নি সেদিন তিনি।

দেখা গেল, বিক্রমপুরে টেলিগ্রাম টেলিফোন লাইনের কোন চিহ্নও আর বর্তমান নেই। শুধু লোহার থামগুলো দাঁড়িয়ে আছে এখানে ওখানে রিক্ত সর্বহারার মত।

ঘুম ভাঙল পুলিশ বাহিনীর। ওরা ছুটে এল মার্ মার্ শব্দ তুলে। ওরা নিশ্চিত জানে এ বাদলেরই কাজ। বাদল ছাড়া বিক্রমপুরে এ কাজ করার মত আর কোন ছেলে নেই। সুতরাং বাদলকে গ্রেপ্তার করতেই হবে।

কিন্তু না, তারা বাদলকে গ্রেপ্তার করতে পারে নি সেদিন।

বাদল বিক্রমপুর ছেড়ে পালিয়েছেন তখন। দলের নির্দেশও ছিল সেই রকম।

সেই বাদল নির্বাচিত হলেন রাইটার্স বিল্ডিংয়ের আগামী সংগ্রামের সৈনিকরূপে।

বাদল জানেন, তিনি যথার্থ সৈনিক।

আর সৈনিকের জীবনে ব্যক্তিগত কোন প্রশ্নের অবকাশ নেই।

৭ই ডিসেম্বর। ওঁদের অভিযানের আর একটা দিন হাতে আছে। মাত্র আর একটা দিন। তারপরেই কেঁপে উঠবে ব্রিটিশ শক্তির একটা ঘাঁটি—রাইটার্স বিল্ডিং।

কোলকাতা নগরীর বুকে একটা কিছু ঘটবার আশঙ্কার গন্ধ পেয়েছে সবাই।

শহরবাসী জানে কিছু একটা ঘটবেই, পুলিশ বাহিনীও জানে একটা কিছু ঘটা অসম্ভব নয়।

"রক্তে আমার লেগেছে আজ সর্বনাশের নেশা।"

লাল লাল অক্ষরে বড় বড় পোস্টারগুলো কোলকাতা শহরের সর্বত্র।

কিছু একটা না ঘটে যায় না!

চার্লস টেগার্টও জানেন সে কথা। তাই তিনি প্রস্তুত করে রেখেছেন তাঁর পুলিশ বাহিনীকে।

কিন্তু কোথায় কি ঘটবে তা একমাত্র বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের গুটি কয়েক নেতৃবৃন্দই জানেন, আর জানেন বিনয়-বাদল-দীনেশ।

প্রস্তুতি পর্বে আর কারও কোন কিছু জানার কথাও নয়।

আগ্নেয় অস্ত্রগুলো বারবার পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখেছেন এ্যাকসন স্কোয়াডের সদস্যেরা। বহুমূল্য ইউরোপীয় পোষাকগুলো তৈরী হয়ে পৌঁছে গেছে ওদের হেফাজতে। কাল ঐ পোষাক-গুলো পরেই এগিয়ে যাবেন বিনয়-বাদল-দীনেশ। পোষাক দেখে দ্বার-রক্ষীদের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহও জাগবে না যে, ওঁরা কোন দুরভিসন্ধি নিয়ে এসেছেন, বরং ওঁরা ভাববে, ওরা হয়তো বা কোন অফিসার।

প্রস্তুতি পর্ব প্রায় শেষ।

কিন্তু নিকুঞ্জ সেনের মনটা খুঁত খুঁত করছে।

একটা প্রয়োজনীয় বিষয় তাঁর মনে পড়ে গেছে।

বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের কর্মীরা রাইটার্স বিল্ডিং-এর একটা নক্সা দিয়েছেন বিনয়-বাদল-দীনেশকে। নক্সাটি নিখুঁত। সমস্ত অলিগলির ড্রইং সেখানে রয়েছে। তবু নক্সা হতে জ্ঞান আহরণ, আর প্রত্যক্ষ-দর্শীর অলিগলি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া—এ দুয়ের মধ্যে ফারাক্ আছে বৈকি।

অস্বীকার করতে পারেন নি বিষয়টি নিকুঞ্জবাবু। হঠাৎ তাঁর মনে পড়ে গিয়েছিল সে কথা। আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি মনস্থির করে ফেলেছিলেন ওদের তিনজনের একজনের অন্ততঃ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হলে ভাল হয়।

বিনয়কে প্রথমেই বাদ দিলেন তিনি। বিনয়কে নিয়ে যাওয়া চলে না। কারণ বলা যায় না বিনয়কে যদি কেউ চিনে ফেলে তা হলে আগামী কালের সমস্ত পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে, সুতরাং এমন ভুল করা চলে না।

তাঁর মনে পড়ল দীনেশের কথা।

দীনেশকে তিনি বললেনও সে কথা।

চল, দীনেশ তোমাকে একবার রাইটার্স বিল্ডিং-এর খুঁটিনাটি গলি গুলো দেখিয়ে নিয়ে আসি। ঠাণ্ডা মাথায় সব দেখে শুনে এলে কাল চলা ফেরা করতে খানিকটা সুবিধাই হবে। আর তা ছাড়া প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মূল্য অনেক বেশী।

চমকে উঠলেন দীনেশ। ঠাণ্ডা মাথায় সব দেখে শুনে কাজ করা কোন দিনই তার ধাতে সয় না। নিকুঞ্জবাবুর কথা শুনে তাই হাসলেন দীনেশ।

আমাকে তো চেনেনই আপনি। ওসব দেখে শুনে কোনদিনই

কিছু করতে পারলাম না। আমি গেলে হয়তো একেবারে রণং দেহি হুঙ্কার ছেড়ে বসব। তার চেয়ে বাদলকে সঙ্গে নিন। বাদল ঠাণ্ডা মাথায় সব কিছু দেখে-শুনে আসবে।

আর কিছু বলেন নি নিকুঞ্জবাবু। তিনি তো চেনেন অগ্নিযুগের ইতিহাসের এই বারুদ-স্তূপ সদৃশ সৈনিক দীনেশ গুপ্তকে।

বাদলকে সঙ্গে নিয়ে নিকুঞ্জবাবু এলেন রাইটার্স বিল্ডিং-এ। একজন পরিচিত কর্মচারী বাদলকে গোটা রাইটার্স বিল্ডিং ঘুয়ে দেখিয়ে নিয়ে এলেন।

এবারে সম্পূর্ণ প্রস্তুতি পর্ব।

নিশ্চিন্ত হয়েছেন এ্যাকসন স্কোয়াডের অন্যতম নেতা নিকুঞ্জ সেন।

৮ই ডিসেম্বর।

অবশেষে এল সেই দিন।

অগ্নিযুগের রক্তরাঙা ইতিহাসে নতুন অধ্যায় রচনার দিন।

অবিস্মরণীয় দিন।

'যে শুনেছে কানে
তাহার আহ্বান গীত, ছুটেছে সে নির্ভীক পরাণে
সঙ্কট আবর্ত মাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ব বিসর্জন
নির্যাতন লয়েছে সে বক্ষপাতি, মৃত্যুর গর্জন
শুনেছে সে সঙ্গীতের মত।'

এ আহ্বান শুনেছেন দীনেশ, শুনেছেন বাদল, শুনেছেন বিনয়ও।

স্বাধীনতার বেদীমূলে আজ ওদের আত্মোৎসর্গের দিন। ওরা নিশ্চিত জানে, এ্যাকসন শেষে, কর্তব্য শেষে ওরা কেউ আর ফিরে আসবে না। পৃথিবীর হাসি কান্না কান পেতে শোনার অবসর আর মিলবে না।

ওরা কিন্তু নির্বিকার।

দুর্ভাবনা নেই বিন্দুমাত্র।

মৃত্যু তাদের কাছে খেলার সামগ্রী।

ওরা অনুভব করেছে মনে প্রাণে, 'রক্তে আমার লেগেছে আজ সর্বনাশের নেশা।'

সকাল থেকেই সাজ-সাজ রব পড়েছে নিউ পার্ক ষ্ট্রীটের গুপ্ত-কেন্দ্রে। সাজ-সাজ রব পড়েছে মেটিয়া বুরুজের রাজেন গুহের বাড়ীতেও। এখানে বাদল আর দীনেশ। ওখানে বিনয় বোস।

আজ বিদায় দেওয়ার পালা ওদের তিনজনকেই।

নিকুঞ্জবাবু বাদল আর দীনেশের জন্য ফিস্টের আয়োজন করেছেন। মাংস, দই-মিষ্টি—কোন কিছুর কমতি নেই। খাইয়ে হিসেবে দীনেশের সুনাম আছে। আজ কিন্তু বাদলও সমানে পাল্লা দিয়েছেন দীনেশের সঙ্গে।

ওদিকে বিনয়ও প্রস্তুত হচ্ছেন।

ঠাকুর পো, খেয়ে নাও ভাই। না খেলে সারা জীবন আমার দুঃখ রয়ে যাবে।

রাজেন বাবুর স্ত্রীর চোখ দুটি জলভারে অবনত। আসন্ন বর্ষণের ইঙ্গিত তাঁর চোখে-মুখে।

মাছ-মাংস-পোলাও-দই-মিষ্টি সবই ধীরে ধীরে খেয়ে নিয়েছিলেন বিনয়। তিনি তাঁর স্নেহময়ী বৌদি অথচ মা-কে আঘাত দিতে পারেন নি।

বাদল আর দীনেশকে নিয়ে রওনা দিয়েছিলেন নিকুঞ্জ সেন নিউ পার্ক ষ্ট্রীটের গুপ্ত আস্তানা ছেড়ে।

আর ওদিকে আসন্ন বিদায় কালে বিনয়কে বিদায় দিতে গিয়ে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না বৌদি।

বৌদির কান্না দেখে বিনয়ের ভেঙে পড়লে তো চলবে না! মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে দৃঢ় করে নিয়েছিলেন তিনি।

বৌদি, তুমি না পরাধীন দেশের বিপ্লবী! এ দেশের মায়েরা একদিন ছেলেকে যুদ্ধের পোষাকে সাজিয়ে দিয়েছেন। আর তুমি সেই দেশের নারী হয়ে কাঁদছ! এ দুর্বলতা তোমার সাজে না।

বৌদি দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলেছিলেন।

আপন হাতেই সাজিয়েছিলেন বিনয়কে।

এমন সৌভাগ্য, এমন সুযোগ জীবনে আর আসবার নয়।

এ্যাকসন স্কোয়াডের অন্যতম সদস্য রসময় শূর বিনয়কে নিয়ে বের হলেন পথে।

আর পলকহীন দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে রইলেন বৌদি অপসৃয়মাণ বিনয়ের দিকে।

দুঃখে শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন তিনি।

তবু বুকের বেদনা প্রকাশের নয়। পরাধীন দেশের মায়েদের কান্নার সময় এখন নয়। মুখে হাসি ফুটিয়ে রাখতেই হবে।

খিদিরপুর পাইপ রোডের মোড়ে এসে দাঁড়াল দুটো ট্যাক্সী।

নিউ পার্ক স্ট্রীট থেকে এসেছেন দীনেশ, বাদল আর নিকুঞ্জ সেন। মেটিয়া বুরুজ থেকে আসলেন রসময় শূর আর বিনয় বোস।

ট্যাক্সী দুটো ছেড়ে দেওয়া হল এখানেই। সাবধানীর মার নেই। শেষ সময়ে ভরা-ডুবি না হয়। নেওয়া হল আর একটা ট্যাক্সী।

এবারে যাত্রা হবে শুরু।

বিনয় বাদল দীনেশ ট্যাক্সীতে উঠে বসেছেন।

একটা ইঙ্গিত মাত্র।

ট্যাক্সীটা তুলে উঠল। এগিয়ে চলেছে ওটা। লক্ষ্য ডালহৌসী স্কোয়ার।

রসময় শূর ও নিকুঞ্জ সেন তুজনেই ঠায় দাঁড়িয়ে আছেন। চোখ তুটো তাঁদের জলে ঝাপসা হয়ে আসে। ওঁরা জানেন বিপ্লবীর কান্না শোভা পায় না, তবু ঠিক এই মুহূর্তে ওঁরা আর নিজেদের সামলে রাখতে পারলেন না।

তবু একটা সান্ত্বনা তাঁদের আছে। তাঁরা জানেন, নতুন অধ্যায় রচিত হবে।

এ অধ্যায়ের রচয়িতা বিনয়-বাদল-দীনেশ।

ওরা আর ফিরে আসবে না।

আঠার, কুড়ি আর বাইশ বছরের তিনটি তাজা প্রাণ সমাজ-শাপের নিঃশ্বাসে শুকিয়ে যাবে।

কিন্তু ওঁদের এই আত্ম-বিসর্জন, আত্মদান—তা তো ব্যর্থ হওয়ার নয়! ওঁরা যে স্বাধীনতার যূপকাষ্ঠে নিজেদের বলি দিচ্ছেন! পরবর্তী কালের মুক্তি সৈনিকদের মনের মণি-কোঠায় তিনটি নাম উজ্জ্বল হয়ে থাকবে—বিনয়-বাদল-দীনেশ।

ঢাকায় লোম্যান ২৯শে আগষ্ট নিহত হয়েছেন বীর বিপ্লবী বিনয় বোসের হাতে।

আর আজ ৮ই ডিসেম্বর।

মাঝখানে তিনটি মাসের ব্যবধান।

এবারের প্রথম লক্ষ্য কারা বিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেল লেফ্‌টেন্যান্ট কর্ণেল সিম্পসন।

উনিশ শ' তিরিশের এপ্রিলে অসহযোগ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ধৃত বন্দীদের জায়গা দিতে পারছিলেন না আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের সুপারিন্টেনডেন্ট মিঃ সোম্‌দত্‌।

রোজই বন্দীর সংখ্যা বাড়ছে। অথচ জেল সুপার নির্বিকার চিত্তে বন্দীদের নিচ্ছেন। প্রতিবাদ জানাচ্ছেন না তিনি। স্থান সঙ্কুলান যে আর হচ্ছে না সে খবরও তিনি জানাচ্ছেন না কর্তৃপক্ষকে। দ্বিধাহীন চিত্তে এই সত্যাগ্রহী বন্দীদের তিনি থাকবার ব্যবস্থা করলেন তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদীর সাথে।

সত্যাগ্রহী বন্দীর দল রাজী নয় মিঃ সোম্‌দতের এই ব্যবস্থায়। তাঁরা প্রতিবাদ জানালেন।

গর্জে উঠলেন জেল সুপার।

কিন্তু ওঁরা ভয় পায় না এই গর্জনে।

ওঁদেরও কণ্ঠ সোচ্চার, 'বন্দেমাতরম্'।

পাগলাঘন্টি বেজে উঠেছিল সেদিন। ছুটে এসেছিল সশস্ত্র পুলিশের দল।

সুভাষচন্দ্র, জে. এম. সেনগুপ্ত, সত্য বক্সী প্রমুখ নেতারা বেরিয়ে এসেছিলেন নিজ নিজ ওয়ার্ড থেকে।

কী ব্যাপার? পাগলাঘণ্টি কেন?

যে যার ওয়ার্ডে ফিরে যাও। হুকুম দিয়েছিলেন জেল সুপার।

কিন্তু কেউ গ্রাহ্যের মধ্যে আনেন নি জেল সুপারের হুকুম।

আর সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশের গোলাম সোম্‌দত্ হুকুম দিলেন চার্জ।

শুরু হল লাঠি চার্জ।

আলিপুর জেলে লাঠি চার্জের সংবাদ মুহূর্তের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছিল সারা শহর কোলকাতায়।

সুভাষচন্দ্রের আঘাত অত্যন্ত বেশী। জীবন সংশয় দেখা দিয়েছে তাঁর।

ক্ষেপে উঠেছিলেন বিপ্লবী দল।

না, জেল সুপার ক্ষমা পেতে পারে না।

দলীয় নির্দেশ পেলেন বীরেন ঘোষ।

একজন সুযোগ্য সহকর্মী নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন বীরেন ঘোষ। পকেটে রিভলভার। সুভাষ বসুর রক্তের ঋণ তাকে শোধ করতেই হবে। মৃত্যুই তার একমাত্র শাস্তি। সুভাষ বসুর গায়ে হাত তোলার ক্ষমা নেই।

বুঝতে পেরেছিলেদ সোম্‌দত! বিপ্লবীদের কাছে তিনি ক্ষমা পাবেন না। সুতরাং আর বাংলা দেশ নয়। পঞ্চনদের বীর পুরুষ সোমদত্ পালিয়ে বাঁচলেন সেদিন।

আর সেদিন সঙ্গে সঙ্গেই বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের কর্মকর্তাগণ বুঝতে পারলেন আলিপুর জেল বা মেদিনীপুর জেলের সুপারিন্টেনডেন্টরা পৈশাচিক নির্যাতনের জন্য যত বেশী দায়ী তার চেয়ে বেশী দায়ী কারা বিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেল লেফ্‌টেন্যান্ট্ কর্ণেল সিম্পসন।

সুতরাং সিম্পসনই ওদের এবারের লক্ষ্য।

বন্দেমাতরম্-সিদ্ধ মন্ত্রে দীক্ষিত তিন মুক্তি সৈনিক এগিয়ে চলেছেন।

দেশ-প্রেমই তাঁদের কাছে একমাত্র সত্য।

বুকে তাঁদের দুর্বার সাহস, অন্তরে তাঁদের সাফল্যের সম্ভাবনার দ্যুতি।

বাধা আসবে। নিশ্চয়ই আসবে। কিন্তু আসলেই বা কি! সব বাধাকে অতিক্রম করে যেতেই তো তাঁরা অভ্যস্ত!

চরম মূল্য হয়তো বা দিতে হবে এর জন্য।

কিন্তু মৃত্যুভয়ে ভীত নয় ওরা। ওরা জানে, ওদের মৃত্যু পথ দেখাবে দেশের অগণিত তরুণ সম্প্রদায়কে। ওদের নির্দেশিত পথ ধরেই ছিনিয়ে নেবে শক্তি মদমত্ত ব্রিটিশের কাছ হতে স্বাধীনতা।

পোষাকের ঠাটে ওরা সেদিন অনায়াসেই রাইটাস বিল্ডিং-এর একতলা থেকে দোতলায় উঠে এসেছিলেন। প্রহরীরা বাধা দেয় নি। কারণ ওদের কোন সন্দেহের অবকাশ ছিল না।

বিপ্লবের প্রদীপ্ত সূর্য বিনয় বোস। অসম্ভবের নায়ক। যৌবনের অগ্রদূত। অধিনায়ক তিনি আজকের অভিযানে।

অধিনায়ক বিনয় বোস ফিস্ ফিস্ করে বললেন দীনেশ আর বাদলকে।

তোমরা প্রস্তুত?

ওরা সসম্ভ্রমে নিজেদের প্রস্তুতির কথা জানিয়েছিলেন।

অধিনায়কোচিত স্বরে নির্দেশ দিয়েছিলেন বিনয় বোস, মনে রেখো, প্রতিটি গুলি আমাদের কাছে মূল্যবান। ওগুলোর সদ্ব্যবহার করতে হবে আমাদের।

ওরা মাথা পেতে আদেশ শুনেছিলেন অধিনায়কের।
আমাদের প্রথম টার্গেট সিম্পসন।

কর্ণেল সিম্পসন তাঁর নিজের ঘরেই রয়েছেন।

পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর পার্সোন্যাল অ্যাসিষ্ট্যান্ট জ্ঞান গুহ।

দুর্বার বেগে বেপরোয়া বিনয়-বাদল-দীনেশ এগিয়ে এলেন সিম্পসনের ঘরের দিকে।

ওরা তোমার মৃত্যুদূত সিম্পসন। এবার তুমি জবাব দাও, কেন তুমি বিপ্লবীদের বার বার লাঞ্ছিত করেছ কারাগার কক্ষে? কেন তোমার নির্দ্দেশে বিশ্বের মহান বিপ্লবী সুভাষচন্দ্রের রক্ত ঝরেছিল জেল সুপার সোমদত্তের অধীনস্থ পুলিশ বাহিনীর লাঠির আঘাতে?

গর্জে উঠেছিল একই সঙ্গে তিন তিনটি রিভলভার।

এলিয়ে পড়েছিলেন সিম্পসন তাঁর চেয়ারে। সিম্পসনকে মৃত্যু উপহার দিলেন বাংলার তিন বিপ্লবী বীর।

বিনয় সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ দিলেন।

এখানে আর নয় এবারে হোম সেক্রেটারী আলবিয়ান।

একঘর থেকে আর একঘরে যাওয়ার পথে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলেন একজন ইংরেজ সেক্রেটারী। কিন্তু ব্যর্থ এ প্রচেষ্টা। বাধা দেওয়ার শখ তার মিটে গেল একটি গুলিতেই।

বিভীষিকা দেখা দিয়েছে রাইটাস বিল্ডিং-এ।

ভীত সন্ত্রস্ত জনতা পালাচ্ছে। প্রাণ নিয়ে ছুটছে সবাই।

মরিয়া বিনয়-বাদল-দীনেশ।

হোম সেক্রেটারী আলবিয়ান মারের অফিস। গুলির আঘাতে জানালাগুলোর কাঁচের পাল্লা ভেঙে পড়েছে।

ইনস্‌পেক্টর জেনারেল অব্ পুলিশ মিঃ ক্রেগ এ শব্দ শুনেছেন। ছুটে এসেছেন তিনি। গুলি ছুঁড়লেন ওদের লক্ষ্য করে।

জবাব পেয়েছেন গুলিতেই।

মিঃ ফোর্ড, মিঃ জোনস্ ওরাও কয়েক রাউণ্ড গুলি চালিয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতে বাধ্য হয়েছেন।

না, বাংলা মায়ের তিন দামাল ছেলেকে বাধা দেওয়া তাদের সাধ্যের বাইরে।

ব্রিটিশদের আর্ত চীৎকারে রাইটার্স বিল্ডিং সেদিন মুখরিত।

সবারই মুখে এক কথা।

বাঁচাও—বাঁচাও!

সাহায্য চাই—সাহায্য চাই।

সন্ত্রাসবাদীরা রাইটাস বিল্ডিং আক্রমণ করছে। এক্ষুণি সাহায্য প্রয়োজন।

চমকে উঠেছিলেন টেগার্ট লালবাজারে বসে।

রাইটাস বিল্ডিং হতে লালবাজারের দূরত্ব এমন আর কী? সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন তিনি।

এতক্ষণে পরিষ্কার হয়ে গেল তাঁর কাছে কোলকাতা মহানগরীর বুকে লাল লাল অক্ষরে লেখা পোষ্টারগুলোর অর্থ। তিনি জানতেন ব্রিটিশ-ভারতে সাধারণ মানুষ আর পড়ে মার খাবে না। ওরা এর জবাব দেবেই।

চার্লস টেগার্ট তাঁর পুলিশ বাহিনী নিয়ে হাজির হলেন।

ডেপুটি কমিশনার গর্ডন ও বার্ট এলেন। অগণিত পুলিশ আর মিলিটারিতে ভরে গেল রাইটার্স বিল্ডিং-এর চতুর্দিক।

উঠে গেলেন টেগার্ট। পেছনের উদ্যত রাইফেল রিভলভার হাতে পুলিশ বাহিনী ও অন্যান্য অফিসাররা।

কিন্তু পরাজয় স্বীকার করতে হল টেগার্টকে। পারলেন না তিনটি যুবকের নিক্ষিপিত গুলির ব্যূহ ভেদ করে উপরে উঠতে।

ওরা যে অমিত শক্তির অধিকারী আজ। ওদের সামনে দাঁড়াবার মত সাহস আজ পররাজ্য লোভী বর্বর ব্রিটিশের নেই।

অধিনায়ক বিনয় বোস এর মধ্যেই আদেশ দিলেন এবারে পাসপোর্ট অফিস।

ওরা রেহাই পেতে পারে না।

পালাচ্ছে ওরা।

টেগার্ট হতভম্ব।

ডাক পড়ল গুর্খা বাহিনীর।

শুরু হল যুদ্ধ।

নীচে অগণিত গুর্খা সৈন্য দূর পাল্লার রাইফেল হতে গুলি ছুঁড়ছে আর উপরে তিনজন মাত্র অল্প বয়েসী যুবক স্বল্প পাল্লার রিভলভার হাতে প্রত্যুত্তর জানাচ্ছে গুলির বিনিময়েই।

যুদ্ধ তখন তীব্রতম হয়ে উঠেছে। বারান্দা ব্যাটল।

গুলির শব্দই তখন শুধু শোনা যাচ্ছে।

ড্রাম্! ড্রাম্! ড্রাম্!

বারুদের গন্ধ বাতাসে। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় সব অস্পষ্ট।

তবু শোনা যায় মর্মভেদী আহ্বান, 'বন্দে মাতরম্'।

ওরা একেবারে বেপরোয়া। মরিয়া হয়ে অধিনায়ক হুকুম দিচ্ছেন, চালাও। কোন দ্বিধা নয়, মাতৃ-মুক্তি-পণ আমাদের। আমাদের পথ বেয়েই এগিয়ে আসবে ভাবী কালের মাতৃ-মুক্তি সৈনিক দল। সুতরাং কোন দ্বিধা নয়—মুহূর্তের জন্যও থামলে চলবে না।

এলিয়ে পড়লেন জুডিসিয়াল সেক্রেটারী মিঃ নেল্‌শন্। এলিয়ে পড়লেন মিঃ ট্যয়নাম্।

বিভীষিকার তাণ্ডব নৃত্য শুরু হয়েছে তখন রাইটার্স বিল্ডিং-এর বুকে।

একটা গুলি বিদ্ধ হল দীনেশের বাঁ হাতে। সেজন্য ভয় বা ভ্রূক্ষেপ নেই বিন্দুমাত্র দীনেশের। হাসতে হাসতে জানালেন অধিনায়ককে।

ডান হাত ঠিক আছে। আমি সম্পূর্ণ সুস্থ।

ওদের চোখের সামনে তখন একটি মাত্র শপথ ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হচ্ছে: করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে।

রণক্ষেত্র বিস্তৃতি লাভ করেছে। কখনো এ বারান্দা, কখনো বা সেই বারান্দা।

আর তারই ফাঁকে ফাঁকে ওদের জলদ প্রতিম স্বর শোনা যাচ্ছে, 'বন্দেমাতরম্'।

বাদল জানিয়েছিলেন অধিনায়ককে।

আর গুলি নেই। ফুরিয়ে গেছে।

দীনেশের দিকে মুখ ফেরাতেই জানিয়েছিলেন অধিনায়ককে, তার মাত্র আর একটা অবশিষ্ট আছে।

বিনয় পরীক্ষা করে দেখলেন তারও মাত্র একটা।

উপায় ?

ধরা পড়লে চলবে না। ব্রিটিশের আদালত বিপ্লবীদের জন্য যে নয় তা তাঁরা ভালভাবেই জানেন। তাই তাঁরা ঠিক করলেন এবারে একটা খালি ঘরে ওদের তিনজনকে ঢুকে পড়তে হবে। বিদায় নিতে হবে ওখানেই। ওঁদের আত্মোৎসর্গেই ফুল হয়ে ফুটে উঠবে হাজার হাজার মুক্তি সৈনিক দল।

বিনয় জানতে চাইলেন দীনেশ ও বাদলের অভিমত।

ওঁরা অনিধায়ককে সমর্থন জানিয়েছিলেন। ওঁরা যে সৈনিক। ওঁরা শুধু আদেশ পালন করতেই অভ্যস্ত।

তিনজনেই ঢুকে পড়েছিলেন একটা ঘরে।

বাদল সায়ানাইডের পুরিয়া পকেট থেকে বের করে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়েছেন। সায়ানাইড ওদের সঙ্গেই থাকে—আত্মরক্ষার শেষ অস্ত্র।

দীনেশ আর বিনয় দুজনেই দুজনের রিভলভার প্রস্তুত করেছেন।

আর দেরী নয়।

বজ্র-নির্ঘোষ ছন্দে ওরা গর্জন করে উঠলেন, 'বন্দেমাতরম্'।

শেষ বারের মত ওঁদের হাতের রিভলভার গর্জন করে উঠল—নিজেদের দিলেন বলিদান।

লুটিয়ে পড়লেন ওঁরা মাটিতে!

অগ্নিযুগের ইতিহাসাকাশের তিনটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের পতন হল।

বন্ধ হল বারান্দা ব্যাটল।

লেখা হল লাল অক্ষরে তিনটি নাম।

বিনয়-বাদল-দীনেশ।

না, আর কোন গুলির শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না।

এবার টেগার্ট উপরে উঠে এলেন।

দেখলেন, তিনজন যুবক মাটিতে পড়ে আছে। একজন মৃত অপর দুইজন গুরুতর আহত।

বাদল সায়ানাইডের পুরিয়া মুখে দিয়েছিলেন। সৈনিক তিনি। সৈনিকের মতই হাসতে হাসতে বিদায় নিলেন তিনি। রচনা করলেন ইতিহাসের নতুন অধ্যায়—যে অধ্যায়ে তিনি শিক্ষা দিলেন সৈনিকের জীবন শুধু আদেশ পালনের, কৈফিয়ৎ তলবের নয়। নিকুঞ্জ সেনের হাতে গড়া বাদল আর নেই।

দীনেশ গুপ্ত আহত। গলার বাঁ দিকে গুলি ঢুকেছে। সায়ানাইড কোন কাজ করতে পারে নি, তা পেটে পৌঁছায় নি।

আহত বিনয় বোসও। গুলি কপালের দুই দিকে বিঁধেছে। কিন্তু জ্ঞান আছে তাঁর।

টেগার্ট প্রশ্ন করলেন তাঁকে, তোমার নাম কি?

মুহূর্তের জন্য হাসি ফুটে উঠল বিনয়ের মুখে।

যাকে তোমরা হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছ, আমি সেই বিনয় বোস।

চমকে উঠেছিলেন টেগার্ট।

ওরা কারা?

বলব না।

না, আর কোন কথা নয়। এবারে বিনয় পরম নিশ্চিন্তে চোখ বন্ধ করেছিলেন।

অপার অগাধ শান্তি পেয়েছিলেন যেন তিনি।

তৎপর হয়ে উঠল ব্রিটিশ পুলিশ।

শুরু হয়েছে পোষাক পরিচ্ছদের তল্লাসী।

শেষ খবরে জানা যায়, একজন আততায়ী আত্মহত্যা করিয়া মরিয়াছে। অপর দুই জন আশঙ্কাজনক অবস্থায় অবস্থান করিতেছে।

একজনকে বিনয় বসু বলিয়া নিশ্চিত রূপে জানা গিয়াছে। সে নাকি ওই মর্মে এক মৃত্যুকালীন জবানবন্দী দিয়াছে যে, সে-ই বিনয়কৃষ্ণ বসু এবং সে-ই মিঃ লোম্যানকে হত্যা করিয়াছে।

আততায়ীগণ তিনজনেই ইয়োরোপীয় পোশাকে ভূষিত হইয়াছিল। বারান্দা দিয়া গুলি করিতে করিতে অগ্রসর হইবার সময় তাহারা 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি করিতেছিল।

ধন্য তুমি বাদল!

তুমিই যথার্থ সৈনিক।

ব্রিটিশ আদালতের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বিচারের প্রহসন তোমাকে শুনতে হল না। আর শুনেই বা কী করতে? জানোই তো ওদের বিচারে অর্থ টুকু ভালভাবেই।

বাদল মারা গেছে। কিন্তু তার মৃত-দেহ এখনও সনাক্ত হয় নি সুতরাং ওটা ছাড়া চলে না।

তিন তিনটি দিন পার হয়ে গেল।

বাদলের পকেট থেকে পাওয়া গিয়েছিল একটা তিন রঙা জাতীয় পতাকা আর একটা কার্ড। বি. এন, দে এই তিনটি অক্ষর নামাঙ্কিত এই কার্ডখানা কিন্তু পরিচয়টাকে সরল করে তুলতে পারে নি।

অবশেষে সনাক্ত করলেন বাদলের কাকা। বরাহনগরের টি. গুপ্ত। তিনি জানালেন বাদল আমার ভাই-পো। ওর ভাল নাম সুধীর গুপ্ত।

বাদল কি আপনার কাছেই থাকত?

না।

তাহলে ও কোথায় থাকত?

ঢাকায়। বিদ গাঁও গ্রামে ওর বাড়ী।

এখানে কি করে এল?

বলতে পারব না। জানি না।

বাদলের মৃত্যু, বাদলের আত্মোৎসর্গ স্মৃতির পাতায় অক্ষয় সামগ্রী হয়ে রইল।

নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান,
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।

মুক্তি মন্ত্রে দীক্ষিত স্বেচ্ছায় বন্দী বিনয় বোসকে চরম শাস্তি দিতে গিয়ে বৃটিশ শাসক সেদিন ব্যর্থ হয়েছিল।

খ্যাতনামা চিকিৎসকগণ বিনয়কে সারিয়ে তোলার চেষ্টা চালাচ্ছেন পুরোদমে। অবস্থা আশাপ্রদ। হয়তো বেঁচে যাবেন এ যাত্রা চিকিৎসার গুণেই।

বিনয়কে ভাল করে তুলতেই হবে ব্রিটিশ শাসকের এ মরণ পণ।

অসুস্থ বিনয়ের হাতের আঙুলগুলো অনেক আগেই বুটের আঘাতে মাড়িয়ে থেঁতলে খানিকটা গায়ের ঝাল মেটাতে চাইলেও সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি পায় নি। বিনয়কে এমন শাস্তি ওরা দেবে যাতে স্বদেশ প্রেমিকদের স্বদেশ প্রেমের নেশা টুটে যায়!

কিন্তু এ স্বদেশ প্রেম তো ধার করে আনা সম্পদ নয়। এ যে অন্তরের সামগ্রী। মনের মণি কোঠায় এর জন্ম যেখানেই সে লালিত পালিত, বিবর্ধিত তাকে ছেঁটে কেটে বাদ দেওয়ার সামর্থ পর-রাজ্য-লোভী ব্রিটিশের নেই।

বিনয় তার প্রমাণ দিলেন আর একবার।

তিনি তো বেশ সুস্থ হয়ে উঠলেন। কিন্তু তিনি জানতেন ব্রিটিশের দয়া-দাক্ষিণ্যের, সেবা-শুশ্রূষার ভিক্ষা গ্রহণ মানেই ওদের কাছেই হেরে যাওয়া। হারতে চাইলেন না তিনি। কোনদিনই তো তিনি হারেন নি। আজকেই বা হারবেন কেন? আত্মসম্মান খোয়াতে তিনি রাজী নন।

মিট ফোর্ড মেডিকেল স্কুলে প্রাক্তন কৃতী ছাত্রের আত্মসম্মান রক্ষার চাবি কাঠি খুঁজে পেতে দেরী হয়নি। আত্মহননের সুযোগও

পেলেন তিনি। মাথার ক্ষতস্থানে গভীর ভাবে আঙুল ঢুকিয়ে ঘা-টাকে বিষাক্ত করে তুললেন তিনি নিজেই।

চমকে উঠলেন চিকিৎসকবৃন্দ। তাদের গম্ভীর মুখের আশাহতের বেদনা অত্যন্ত স্পষ্ট।

পাঁচ পাঁচটা দিন কেটে গেলেও আশার আলো দেখতে পেলেন না তাঁরা। বিনয়ের জীবনী-শক্তি এখন ফুরিয়ে আসছে এটুকু তারা বুঝতে পেরেছিলেন অত্যন্ত অনায়াসে।

চার্লস টেগার্টের বিরুদ্ধে বিনয় চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিলেন আজ তা পূরণ হ'তে চলেছে। জীবন্ত সিংহশিশু বিনয় বোসকে ধরার সাধ্য ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর কোনদিনই হল না।

আজ তো বিনয় মৃত্যুর পথযাত্রী। অন্তিম মুহূর্ত সমাগত

শেষ মুহূর্তে বিনয় বোসের সঙ্গে দেখা করার আবেদন জানালেন তার বড়দা বিচারপতি মিঃ রক্সবার্গের কাছে।

আবেদন মঞ্জুর হয়েছিল।

বিজয় বোস বাবা মাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন মৃত্যু পথযাত্রী বিনয়কে দেখতে। কিন্তু মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের কর্ম-কর্তাগণ আদালতের হুকুম নামা মানেন নি। চার্লস টেগার্টের অনুমতি ব্যতিরেকে তারা কাউকে বিনয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার করবার অনুমতি দিতে চান না।

টেগার্টের সঙ্গে দেখা হয়নি বিজয়বাবুর।

তিনি দেখা করলেন ডিষ্ট্রিক্ট কমিশনার সাউথের সঙ্গে। যোগাযোগ করলেন অ্যাসিস্টান্ট কমিশনারের সঙ্গে—সকলের মুখে ঐ এক কথা।

টেগার্ট সাহেবের হুকুম ছাড়া দেখা করার জো নেই।

ক্ষেপে উঠলেন বিজয় বোস।

ব্রিটিশ কর্মচারীদের ছেলেখেলার মাত্রা হারানোয় ক্ষুব্ধ হয়ে ফুঁসে উঠেছিলেন বিজয় বোস।

মৃত্যু পথযাত্রী সন্তানকে তার পিতামাতা শেষ সময়ে দেখতে পাবেন না এতবড় অন্যায় আচরণ, এতবড় অন্যায় আব্দার মেনে নেবেনই কেন?

তাই তিনি সোজা ফিরে এসেছিলেন কোর্টে। আবার বিচারপতি মিঃ রক্সবার্গের এজলাসে?

কেন এই প্রহসন? ওরা যখন হুকুম মানবেই না তখন এ হুকুমনামা নেওয়ার কী দরকার ছিল। টেগার্টই যখন সব, তখন তাকে এমন একটা ছেলে ভুলানো মোয়া ধরানোর মানে কী?

রাগে গর্জে উঠেছিলেন রক্সবার্গ।

এতবড় স্পর্দ্ধা টেগার্টের।

আর তাতে লাভই হয়েছিল বিজয়বাবুর।

অনুমতি পেলেন সহজে। নির্বিঘ্নে পৌঁছালেন তিনি পিতা-মাতাকে সঙ্গে নিয়ে বিনয়ের কাছে।

ঐ তো ওখানে শুয়ে আছে বিনয়।

তার বাবা মার সাত রাজার ধন এক মানিক বিনয়।

বিনয়, আমরা সবাই তোকে যে দেখতে এসেছি!

না সাড়া দেন নি বিনয়। মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছেন তিনি। মুখের প্রতিটি রেখায় সেই কষ্টেরই প্রতিফলন।

পিতা রেবতী মোহন বসুর চোখে মুখে ক্ষোভ নেই। অন্তরে শুধু পুত্র বিয়োগ ব্যথার জ্বালা। তা না হলে এমন পুত্রের পিতা

সেতো পরম ভাগ্যের কথা। তাই মুখের রেখায় শোকের আসন্ন ঝড়ের ইঙ্গিত নেই।

ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা নিয়ে অপেক্ষা করছেন না।

ধীরে ধীরে তিনি হাত রাখলেন ছেলের মাথায়। কণ্ঠে তাঁর শোকদীর্ণ হৃদয়ের আকুতি।

খোকা, একবার চোখ মেলে চা বাবা আমি যে তোকে দেখতেই এসেছি।

মায়ের এ আহ্বান নাড়া দিয়েছিল বিনয়ের মনকে। অচেতন বিনয়, বিকারগ্রস্থ বিনয়ের মুখে দেখা দিয়েছিল একটি পরিতৃপ্তির স্নিগ্ধ হাসির রেখা। হাতটা কপালের কাছে উঠে এসেছিল অত্যন্ত ধীরে ধীরে।

মাকে, জন্মভূমিকে, দেশের লক্ষ লক্ষ নির্যাতিত মানবাত্মাকে তিনি হয়তো বা জানালেন শেষ প্রণাম।

তারপর ?

বাবা মাকে কাঁদিয়ে, অগণিত দেশবাসীকে শোক সাগরে নিক্ষেপ করে, বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের একটি বীর সৈনিকের জীবন দীপ নিভে গেল।

বিনয় অমর ধামে চলে গেলেন।

এ তাঁর আত্ম-হনন।

ডাক্তার ইনচার্জ রেবতীবাবুকে জানিয়েছিলেন সে কথা।

He is determined to die, as he did not take a single dose of medicine nor a single dose of diet.

তেরই ডিসেম্বর বিনয়ের সে ইচ্ছা পূরণ হল। আত্মহত্যার এত প্রচেষ্টা সার্থক হল।

বিনয় নেই। বিনয় মারা গেছেন।

অগ্নিযুগের ইতিহাসাকাশের সব চেয়ে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কটি খসে পড়েছে।

এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়েছিল মুহূর্তের মধ্যে সারা কোলকাতা শহরে।

বিনয় মারা গেছেন ভোর ছয়টায়।

এবার ব্রিটিশ সরকারের কর্তৃপক্ষদের হেফাজৎ থেকে বিনয়ের মৃতদেহ নেওয়া।

সেখানেও কাঠ-খড় পোড়াতে হয়েছিল অনেক।

বিজয়বাবু চীফ্ ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে দরখাস্ত পেশ করলেন।

ওরা জানালেন, মৃতদেহ লাসকাটা ঘর হতে রাত আটটায় পাওয়া যাবে। তবে আর একটা সর্ত, রাস্তায় শবদেহ নিয়ে কোন-রকম ডিমন্‌ষ্ট্রেশন করা চলবে না।

রাজী হয়েছিলেন বিজয় বোস। রাজী না হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না।

জনসমাবেশ করা চলবে না; মিছিল শ্লোগান নয়—সব সর্ত্তই তো মেনে নিয়েছিলেন বিজয়বাবু কিন্তু রাত আটটার ঘর পার হয়ে ঘণ্টার কাঁটাটা দশটার ঘরের দিকে পৌঁছালেও সদাশয় ব্রিটিশ সরকারের দয়া হল না।

আসলে সেদিন ওরা ভয় পেয়েছিল।

ভয় পেয়েছিলেন টেগার্ট।

আবার পোষ্টার। তবে এবারে আর বাংলায় "রক্তে আমার লেগেছে আজ সর্ব্বনাশের নেশা" নয়, এবারে ইংরাজী ভাষার লেখা পোষ্টার। বক্তব্যও সম্পূর্ণ আলাদা।

Benoy's blood becons for blood.

যুব সম্প্রদায়ের ঘুম ভেঙেছে। তাই কর্ত্তৃপক্ষ ঠিক করেছেন

বিনয়ের মৃতদেহ দেওয়া হবে গভীর রাতে—সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়বে। কারণ ওরা সেদিন দেখতে পেয়েছিল মানশ্চক্ষে ব্রিটিশ ভারতে বিনয়ের পদক্ষেপ একটি সূচনা মাত্র।

ব্রিটিশ সরকারের খেয়াল খুশীকে মেনে নিয়ে শোক সন্তপ্ত বিজয় বসু তার ভাইয়ের মৃতদেহ নিয়ে লাসকাটা ঘর থেকে বের হয়ে এসেছিলেন গভীর রাতেই।

ব্রিটিশ সরকারের কর্তৃপক্ষদের ধারণা ছিল এত গভীর রাতে নিশ্চয়ই জনসমাবেশ হবে না। কিন্তু ভুল করেছিলেন ওরা, তাই অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন সেদিন।

সেদিন যেমন ঘুম ছিল না বিজয়বাবুর চোখে, বিনয়ের বাবা-মার চোখে, তেমনি ঘুম ছিল না শহরবাসীর চোখেও।

শহীদ বিনয় তো শুধুমাত্র কোন বিশেষ পিতামাতার সন্তান নয়, বিনয় বোস তো শুধুমাত্র একটি বিশেষ ব্যক্তির ভাই নয়, তিনি যে অগণিত অত্যাচারিত পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ ভারতবাসীর পথ নির্দেশক, গর্ব্বের সামগ্রী।

তাই মৃতদেহ নিয়ে পথে পৌঁছানো মাত্র হাজার হাজার মানুষ এসে পৌঁছেছিল।

ওরা আজ উন্মত্ত।

ওদের রক্তে আজ চঞ্চলতা।

বিনয় বোস—জিন্দাবাদ।

তাদের স্বতঃস্ফূর্ত জয়ধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠল সারা শহর কোলকাতা। লোকে লোকে লোকারণ্য। বিনয়ের পিতামাতা রেবতী মোহন বসু ও ক্ষীরোদবাসিনী দেবী মৃত পুত্রের পাশে পৌঁছাতে হিমসিম খেয়ে গেলেন।

চোখে তাদের আনন্দাশ্রু।

মৃত্যু যে স্বাভাবিক। কেউ তো কাউকেই ধরে রাখতে পারে না। সকলের সব চাওয়াকে নস্যাৎ করে দিয়ে চলে যায় সে।

এ অনন্ত চরাচরে স্বর্গমর্ত্য ছেয়ে
সব চেয়ে পুরাতন কথা, সব চেয়ে
গভীর ক্রন্দন—'যেতে নাহি দিব'। হায়
তবু যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়।

কিন্তু মানুষ যাকে ভালবেসে আপনার করে নিল তার স্মৃতি যে কোনদিন মুছে যাওয়ার নয়—

আমি ভালবাসি যারে
সে কি কভু আমা হতে দূরে যেতে পারে।

শব মিছিল এগিয়ে চলেছে নিমতলা ঘাটের দিকে। অন্তর ওদের দুঃখে শোকে দীর্ণ চোখে মুখে ওদের নয়া শপথের ইঙ্গিত।

বাদল মারা গেছেন আটই ডিসেম্বর।

ব্রিটিশের শক্তিশালী ঘাঁটির উপর আঘাত হানতে গিয়ে আর একটিও গুলি অবশিষ্ট ছিল না তার কাছে। সব গুলির সদ্ব্যবহারান্তে সৈনিক বাদল সায়ানাইডের পুরিয়া খুলে মুখে দিয়েছিলেন।

এই সায়ানাইড কিন্তু বাদলকে ব্যর্থ করে নি। উপহার দিয়েছিল মৃত্যু।

কী অগাধ শান্তি?

ব্রিটিশের বিচারের প্রহসন তাকে দেখতে হল না। অত্যাচারিত উৎপীড়িত জাতির মুখপাত্র বাদল হাসতে হাসতে ব্রিটিশকে ভ্রূকুটি হেনে বিদায় নিলেন।

আর একজনও ব্রিটিশকে কলা দেখিয়ে চির ফাঁকি দিয়ে চলে গেলেন। বারবারই তো তিনি কলা দেখিয়ে ফাঁকি দিয়েছেন—এবার দিলেন চির ফাঁকি। বিনয় বোস ব্রিটিশের চিকিৎসা ও পথ্যকে ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করে বিদায় নিলেন ১৩ই ডিসেম্বর।

তিনজন সৈনিক ব্রিটিশ ভারতে ইতিহাস রচনা করলেন। ভারতের অগ্নিযুগের গৌরবময় ইতিহাস। তাদের দুজন চলে গেলেন।

এখন দীনেশ একা।

সঙ্গী যাঁরা ছিলেন তারা চলে গেলেন। একদিন তাকেও চলে যেতে হবে।

না, দুঃখ নেই তার জন্য তাঁর।

তিনি না বিপ্লবী।

বিপ্লবের পথ যে অনিশ্চিতের পথ। এই অনিশ্চিত পথ ধরে চলতে গিয়ে হয়তো বা এই পথিকদের অনেকেই হারিয়ে যাবেন।

যেমন আজ হারিয়ে গেছেন বাদল, হারিয়ে গেছেন বিনয়। পথ চলতে গিয়ে পায়ে কাঁটা ফুটবে, ক্ষতবিক্ষত হয়ে হয়তো বা তাদের সর্বাঙ্গে ফুটে উঠবে রক্ত কমল। এ তো জানা কথা।

ব্রিটিশ সরকারের কিন্তু দুঃখ হয়েছিল বিনয় বাদলের মত শিকার হাত হতে ফস্কে যাওয়ার জন্য। ওদের শাস্তি দিয়ে যে উদাহরণ ওরা সৃষ্টি করতে চেয়েছিল তা পারল না যখন, তখন দুঃখ ত হবেই।

দীনেশ পাশের বেডে শুয়ে শুয়ে লক্ষ্য করেছিলেন বিনয়কে।

বিনয়ের দাদা, বাবা, মা সকলকে।

কিন্তু আলাপ করার সুযোগ পান নি ওরা। সুযোগ মেলে নি দীনেশের।

আসলে ব্রিটিশ শাসকের পক্ষ থেকে সে সুযোগ ওদের দেওয়া হয় নি।

কাউকেই কাছে আসতে দেওয়া হচ্ছে না দীনেশের। শেষ-কালে কি এই শেষ পাখিটাও উড়ে পালাবে। না, তা হচ্ছে না, সুতরাং ডাক্তার আর নার্স ছাড়া আর কাউকে আসতে দেওয়া হবে না কাছে।

অনেক চেষ্টা, অনেক কষ্ট করার পর দেখা কোরবার অনুমতি পেলেন দীনেশেয় দাদা।

জ্যোতিষ গুপ্তকে সেদিন অনেক দুঃখ পেতে হয়েছিল।

তার এই ভাইটি যে বড় আদরের।

জ্যোতিষ গুপ্ত জিজ্ঞেস করেছিলেন, নসু, কেমন আছিস?

দীনেশ হেসেছিলেন, তৃপ্তির হাসি।

খুব ভাল আছি, দাদা! আমরা কি কোনদিন খারাপ থাকি।

তারপর দীনেশ জিজ্ঞেস করেছিলেন মা, বৌদি আর তার খুকুদির

খবর। বলেছিলেন, আমার জন্য ওদের ভাবতে নিষেধ করবেন আমি ভাল আছি।

চিকিৎসক ও নার্সদের সমবেত প্রচেষ্টায় দীনেশ সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন। চিকিৎসকেরা ধৈর্য্য সহকারে যেমন চিকিৎসা চালিয়ে ছিলেন। দীনেশের তেমনি সহানুভূতি ও স্নেহ প্রীতির সহচর্য্য দিয়েছিলেন নার্সেরা।

একজন বিদেশিনী নার্স যে মায়া মমতার রাজ্যে পৌঁছে দিয়েছিলেন দীনেশকে তা অনুপম।

বিদেশিনী এই নার্সটি জানতেন, তিনি শাসক সম্প্রদায়ের একজন হয়ে প্রকাশ্যে রাজদ্রোহিতার অপরাধে ধৃত বন্দীকে সহানুভূতি ধারায় সিক্ত করতে পারেন নি।

কিন্তু তিনি যে নারী। মায়ের জাত। সেখানে যে শাসক ও শাসিতের ব্যবধান মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না, তাই শত শত রোষ কষায়িত চক্ষুকে ফাঁকি দেওয়ার মত সুযোগও তিনি করে নিতেন।

সুযোগ পেলেই তিনি কাছে আসতেন।

মমতা মাখানো চোখ দুটো দীনেশের সর্বাঙ্গ বুলিয়ে যেন দীনেশের বেদনার উপশম ঘটাতে চাইতেন।

জিজ্ঞেস করেছিলেন বিদেশীনী।

তুমি কি সমস্ত ব্রিটিশ অধিবাসীকেই ঘৃণা কর? আমাকেও?

হেসেছিলেন দীনেশ জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও ধ্যানের আদর্শটিকে তিনি তুলে ধরেছিলেন এই বিদেশিনী মহিলাটির কাছে।

না না তা কেন? সকলকে ঘৃণা করবই বা কেন? ঘৃণা করি তাদের যারা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ ভাবে আমাদের শাসন করার চেষ্টা করে।

বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে আলাপ করার মত সাহস এই বিদেশীনীর

ছিল না। তা ছাড়া বলা যায় না হয়তো তাদের আলাপরত দেখলে দীনেশের শাস্তির মাত্রা বাড়তে পারে, তাই বাইরে পায়ের শব্দ পেয়েই চকিত হরিণীর মত ছুটে পালিয়েছিলেন তিনি।

বলেছিলেন, তোমার দীর্ঘ জীবন কামনা করি। শুভরাত্রি।

(তিন সপ্তাহ কেটে গেছে। দীনেশ এখন সম্পূর্ণ সুস্থ।)

এবার সুরু হল জেরা।

জেরার পর জেরা। কত হাজার রকমের প্রশ্ন। ঘুরিয়ে আবার একই প্রশ্নে পৌছানো।

কে শেখালো যুদ্ধ-বিদ্যা?

কে পাঠিয়েছে তাদের?

কোথায় কোথায় তাদের ঘাঁটি রয়েছে?

মাঝে মাঝে দীনেশ উত্তর দেন, আবার একবারে চুপ করে থাকেন। জবাব দিলেই ছাড়ছে কে? আবার সেই একই প্রশ্নের জের টানতে থাকে ওরা। কোনও না কোন অসতর্ক মুহূর্তে আসল খবর বেড়িয়ে পড়বেই।

কিন্তু আসল খবর বের হয় নি।

নাজেহাল করে তুললেও যে দীনেশ অগ্নিযুগের ইতিহাসের একটা সম্পূর্ণ অধ্যায় রচনা করে গেছেন, সংগঠন শক্তির তুলনাহীন পরিচয় রেখে গেছেন, সেই দীনেশ তো সাধারণ নন।

তিনি যে অসাধারণ।

তাই প্রশ্নবানে তাকে জর্জরিত করা হলেও তাকে কাবু করা যায় নি!

কাবু দীনেশকে কোনদিই করা যায় নি। বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স বাহিনীর যে কোন নির্দেশ দীনেশ পালন করেছেন যথাযথ ভাবেই

দায়িত্ব যত কঠিনই হোক না কেন দীনেশ ঠিক ঠিক তা পালন করেছেন সব সময়েই। ঢাকা, মেদিনীপুর, কলকাতা সব জায়গাতেই রেখে গেছেন তিনি তার স্বাক্ষর।

মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে দীনেশকে নিয়ে আসা হল আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলের কনডেম্‌ড সেলে—কনডেম্‌ড সেল তো ফাঁসীর আসামীদের জন্যই।

শুরু হল দীনেশের বিচার।

আলিপুরের সেসন জজ গার্লিকের সভাপতিত্বে স্পেশাল ট্রাই-বুনালে বিচারের প্রহসন চলল।

উৎসাহ দীনেশের কিন্তু এ সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ও ছিল না।

তিনি ভাবতেন, বিচারের কথা জেনে তার লাভ নেই। তিনি তার আদর্শ অনুযায়ী কাজ করেছেন। এখন ওদের বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে কোন কৌতূহল প্রকাশ করে তার কোন লাভ নেই, দুশ্চিন্তাও নেই।

কিন্তু দুশ্চিন্তা ছিল সেদিন লক্ষ লক্ষ পরাধীন মানুষের।

তারা ভেঙে পড়েছিলেন আদালত প্রাঙ্গণে।

সকলে দেখতে চায় বিপ্লবী দীনেশকে, জানতে চায় অন্তরের শ্রদ্ধা।

দীনেশ কিন্তু নির্বিকার।

যেদিন মামলার রায় দিলেন বিচারপতি গার্লিক সেদিনও দীনেশ এমনই নির্বিকার ছিলেন।

মামলার রায় বিচারপতি কি জানবেন তা দীনেশ জানতেন।

জানতেন প্রতিটি বাঙালী

দীনেশের মনে সে সম্পর্কে কোন আশঙ্কার ঝড় না উঠলেও

দেশবাসী সেদিন কিন্তু মনে-প্রাণে চেয়েছিলেন দীনেশের মুক্তি। অন্ততঃ দীনেশের যেন প্রাণ দণ্ড না দেওয়া হয়।

সে আবেদন পৌঁছায় নি ইংরেজ সরকারের কর্ণে। বধির সেজে হুকুম দিলেন প্রাণদণ্ডের। এখন প্রিভিকাউন্সিল থেকে এ আদেশটাই বলবৎ করিয়ে নিলেই ষোলকলায় পূর্ণ।

প্রিভিকাউন্সিল বহাল রেখেছিলেন এ আদেশ।

দীনেশ তাঁর দাদার মুখে শুনেছিলেন সে কথা।

তাঁর মা ও দাদা তাঁর সঙ্গে দেখা করে চলে গেলে দীনেশ বৌদিকে চিঠি লিখতে বসলেন।

শ্রীচরণেষু,

বৌদি গতকল্য তোমার চিঠিখানা পাইলাম। আজ মা ও দাদা আসিয়াছিলেন। দাদার কাছে শুনলাম, আমার ফাঁসির হুকুমই বহাল রহিয়াছে।

বৌদি, এ জন্মের মত তোমাদের কাছ হইতে বিদায় চাহিতেছি। জানি, বিদায় দিতে তোমার বুক ভাঙিয়া যাইবে, কিন্তু কি করিব বিদায় যে লইতেই হইবে!

অনেক দিনের অনেক কথাই মনে পড়িতেছে। সেই যেদিন তোমাকে আমার বৌদিরূপে পাইলাম, সেদিন হইতে আজ পর্যন্ত সমস্ত কথাই আমার চোখের সম্মুখে যেন ভাসিয়া বেড়াইতেছে। তোমাকে আমার দশ বৎসর বয়স হইতে বিশ বছর বয়স পর্যন্ত অনেক যন্ত্রণাই দিয়া আসিয়াছি। সমস্তই তুমি স্নেহের অত্যাচার রূপে হাসি মুখে সহ্য করিয়া আসিয়াছ, কখনও বিরক্ত হও নাই কখনও মুখভার করিয়া থাক নাই। চিরকালই অসুখে তোমার হাতের বার্লি, আহারে তোমার হাতের রান্না আমার সবচেয়ে ভাল লাগিয়াছে, তাহা তুমি জান।

তুমি আমাকে কেন, আমাদের সকলকেই তোমার একান্ত ভালবাসা

দ্বারা জয় করিয়া লইয়াছিল। সেদিন পর্যন্ত আমার যদি অনেক টাকা হয়, তবে তোমার কি কি প্রিয় জিনিস আমি তোমায় উপহার দিব, সেই সেই সম্বন্ধে নানা উদ্ভট কল্পনা মনে মনে করিয়াছি। যাক্, ভগবান জন্ম জন্মান্তরে তোমার মত বৌদিই যেন আমায় পাওয়াইয়া দেন, এই আমায় প্রার্থনা।

কিসে তোমাদের মনে শান্তি আসিতে পারে, তুমি তাহার উপায় আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছ। আমিই কি আর তা বলিতে পারি। তবে মনে হয় মরণকে আমরা বড় ভয় করি, এই ভয় যদি জয় করিতে পারি, তবে মরণ আমাদের কাছে তুচ্ছ হইয়া দাঁড়াইবে। মরণকে আমাদের ভয় না করিয়া নির্ভয়ে প্রশান্ত চিত্তে বরণ করিয়া লইতে হইবে। মরণকে ভয় করিলে ধর্মের প্রধান সোপানই যে আমরা উত্তীর্ণ হইতে পারিব না। আমরা জানি, মরণ আমাদের হয় না, হয় এই নশ্বর দেহের। আত্মা অবিনশ্বর, সেই আত্মাই আমি—আর সেই আত্মাই ভগবান। মানুষের যখন সে উপলব্ধি হয়, তখনই সে বলিতে পারে 'আমিই সে। আগুন আমাকে পোড়াইতে পারে না, জল আমাকে পচাইতে পারে না, বায়ু আমাকে শুষ্ক করিতে পারে না, আমি অজড়, অমর, অব্যয়। গীতা বলিয়াছেন—শাস্ত্র সকল ইহাকে ছেদন করিতে পারে না। আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য, নিত্য সর্বব্যাপী।'

তুমি বলিবে, এসব কথা তো আমিও জানি, কিন্তু মন তো শান্তি মানিতে চায় না। মন শান্ত করিবার একমাত্র উপায় ভগবানে আত্ম সমর্পন। ইহা ভিন্ন শান্তি পাইবার আর কোন উপায়ই নেই। আমরা যতই জপতপ করি না কেন, যতই ফোঁটা তিলক কাটি না কেন, কিন্তু তাঁহাকে আমরা ভালবাসিতে পারি কই? তাঁহাকে যে ভালবাসিতে পারে, মরণ তো তার কাছে একটা ফাঁকা আওয়াজ মাত্র তাঁকে তেমন করিয়া ভালবাসিয়াছিলেন বাংলার

দেশবাসী সেদিন কিন্তু মনে-প্রাণে চেয়েছিলেন দীনেশের মুক্তি। অন্ততঃ দীনেশের যেন প্রাণ দণ্ড না দেওয়া হয়।

সে আবেদন পৌঁছায় নি ইংরেজ সরকারের কর্ণে। বধির সেজে হুকুম দিলেন প্রাণ দণ্ডের। এখন প্রিভিকাউন্সিল থেকে এ আদেশটাই বলবৎ করিয়ে নিলেই ষোলোকলায় পূর্ণ।

প্রিভিকাউন্সিল বহাল রেখেছিলেন এ আদেশ।

দীনেশ তাঁর দাদার মুখে শুনেছিলেন সে কথা।

তাঁর মা ও দাদা তার সঙ্গে দেখা করে চলে গেলে দীনেশ বৌদিকে চিঠি লিখতে বসলেন।

শ্রীচরণেষু,

বৌদি গতকল্য তোমার চিঠিখানা পাইলাম। আজ মা ও দাদা আসিয়াছিলেন। দাদার কাছে শুনিলাম, আমার ফাঁসির হুকুমই বহাল রহিয়াছে।

বৌদি, এ জন্মের মত তোমাদের কাছ হইতে বিদায় চাহিতেছি। জানি, বিদায় দিতে তোমার বুক ভাঙিয়া যাইবে, কিন্তু কি করিব, বিদায় যে লইতেই হইবে।

অনেক দিনের অনেক কথাই মনে পড়িতেছে। সেই যেদিন তোমাকে আমার বৌদিরূপে পাইলাম, সেদিন হইতে আজ পর্যন্ত সমস্ত কথাই আমার চোখের সম্মুখে যে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। তোমাকে আমার দশ বৎসর বয়স হইতে বিশ বছর বয়স পর্য্যন্ত অনেক যন্ত্রণাই দিয়া আসিয়াছি। সমস্তই তুমি স্নেহের অত্যাচার রূপে হাসি মুখে সহ্য করিয়া আসিয়াছ কখনও বিরক্ত হও নাই কখনও মুখভার করিয়া থাক নাই। চিরকালই অসুখে তোমার হাতের বার্লি, আহারে তোমার হাতের রান্না আমার সবচেয়ে ভাল লাগিয়াছে, তাহা তুমি জান।

তুমি আমাকে কেন আমাদের সকলকেই তোমার একান্ত ভালবাসা

দ্বারা জয় করিয়া লইয়াছিলে। সেদিন পর্যন্ত আমার যদি অনেক টাকা হয়, তবে তোমার কি কি প্রিয় জিনিস আমি তোমায় উপহার দিব, সেই সেই সম্বন্ধে নানা উদ্ভট কল্পনা মনে মনে করিয়াছি। যাক্, ভগবান জন্ম জন্মান্তরে তোমার মত বৌদিই যেন আমায় পাওয়াইয়া দেন, এই আমার প্রার্থনা।

কিসে তোমাদের মনে শান্তি আসিতে পারে, তুমি তাহার উপায় আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছ। আমিই কি আর তা বলিতে পারি। তবে মনে হয় মরণকে আমরা বড় ভয় করি, এই ভয় যদি জয় করিতে পারি, তবে মরণ আমাদের কাছে তুচ্ছ হইয়া দাঁড়াইবে। মরণকে আমাদের ভয় না করিয়া নির্ভয়ে প্রশান্ত চিত্তে বরণ করিয়া লইতে হইবে। মরণকে ভয় করিলে ধর্মের প্রধান সোপানই যে আমরা উত্তীর্ণ হইতে পারিব না। আমরা জানি, মরণ আমাদের হয় না, হয় এই নশ্বর দেহের। আত্মা অবিনশ্বর, সেই আত্মাই আমি— আর সেই আত্মাই ভগবান। মানুষের যখন সে উপলব্ধি হয়, তখনই সে বলিতে পারে, 'আমিই সে। আগুন আমাকে পোড়াইতে পারে না, জল আমাকে পচাইতে পারে না, বায়ু আমাকে শুষ্ক করিতে পারে না, আমি অজড়, অমর, অব্যয়। গীতা বলিয়াছেন—শাস্ত্র সকল ইহাকে ছেদন করিতে পারে না। আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য, নিত্য সর্বব্যাপী।'

তুমি বলিবে, এসব কথা তো আমিও জানি, কিন্তু মন তো শান্তি মানিতে চায় না ঃ মন শান্ত করিবার একমাত্র উপায় ভগবানে আত্ম সমর্পণ। ইহা ভিন্ন শান্তি পাইবার আর কোন উপায়ই নেই। আমরা যতই জপ-তপ করি না কেন, যতই ফোঁটা তিলক কাটি না কেন, কিন্তু তাঁহাকে আমরা ভালবাসিতে পারি কই? তাঁহাকে যে ভালবাসিতে পারে, মরণ তো তার কাছে ফটকা ফাঁকা আওয়াজ মাত্র। তাঁকে তেমন করিয়া ভালবাসিয়াছিলেন বাংলার

নিমাই, প্রেমবতার যীশুখৃষ্ট আর আমাদের দেশের সে সব ছেলেরা যারা হাসি-মুখে মরণকে বরণ করিয়া লইতে পারিয়াছিল।

মনের আবেগে আজ অনেক কথা লিখিয়া ফেলিলাম। তোমাদের কষ্টের কারণ আমি হইয়াছি জানিয়া আমি নিজের মনেও কম ব্যথা পাই নাই। তোমরা আমাকে ক্ষমা করিও।

আমার সঙ্গীটি এখন বেশ ভালই আছে। অসুখ বিসুখ নাই। আমিও ভাল আছি। ভালবাসা ও প্রণাম জানিবে ইতি—

—স্নেহের ঠাকুর পো

মৃত্যু ও আত্মা সম্পর্কে যে দীনেশের এমন ভাবনা তার কাছে ফাঁসির হুকুমের মূল্য কীই বা থাকিতে পারে ?

দীনেশের মনে কোন বিকার জন্মে নি ; ওঠে নি কোন ঝড়।

দীনেশের মনে সেদিন কোন আলোড়ন না উঠলেও আলোড়ন উঠেছিল লক্ষ লক্ষ মানুষের মনে।

বিদেশী শাসকের আদেশ আমরা মানি না, মানব না।

বিপ্লবী নায়িকা বিমলা প্রতিভা দেবী আহ্বান জানালেন বাংলার তরুণ সমাজকে।

এ আহ্বান জেগে ওঠার, ক্লীবের মত অসহায় ভাবে দীনেশের মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা মেনে না নেওয়ার।

এ আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল সব চেয়ে বেশী মেদিনীপুর।

দীনেশের নিজের হাতে তৈরী করা মেদিনীপুর দীনেশের এমন পরিণতি মেনে নেবেই বা কেন? তাই তারা প্রস্তুত হয়েছিল, বদলা নেওয়ার জন্য। বদলা নেওয়ার পালা এসেছে এবার। ওই বর্বর বেনিয়া জাতটাকে ওরা ক্ষমা কোরবে না কোনোদিক থেকেই।

উনিশ শ'। তিরিশের ৭ই এপ্রিল ঝড় উঠল মেদিনীপুরে। মারাত্মক সে ঝড়।

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট কুখ্যাত পেডিকে হত্যা করে ওরা প্রথম বাদল নিল দীনেশের মৃত্যুদণ্ডের।

জেলে বসেই এ খবর দীনেশ পেয়েছিল; হয়েছিলেন আনন্দে আত্মহারা। তার নিজের হাতেগড়া মেদিনীপুর জেগে উঠছে; এ কি কম আনন্দ!

মেদিনীপুরের জাগরণ দীনেশ সম্পূর্ণ দেখে যেতে পারলেন না অর্থাৎ সুযোগ পেলেন না। তার আগেই তাঁকে বিদায় নিতে হল এ পৃথিবী থেকে।

সময়ের গাঁটগুলো পার হয়ে হয়ে দিন এগিয়ে চলেছে।

দীনেশ জানেন, এক একটি দিন ফুরানোর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ফাঁসির দিনটিও এগিয়ে আসছে। কিন্তু দীনেশের মনে সেই বেদনার কোন চিহ্ন নাই।

থাকবেই বা কেন? মৃত্যু সম্পর্কে দীনেশের মত এমন ভাবনা যাঁরা ভাবতে পারেন তাঁদের কাছে মৃত্যু তো বিভীষিকা নয়, মৃত্যু বরণের সামগ্রী। তিনি জানতেন সময় এলে, চির সুন্দর মরণের মহালগ্ন এলে তিনি তাকে বরণ করবেন তার ব্যগ্র দুবাহু মেলে ধরে।

দীনেশ চিঠি লিখলেন তাঁরই সহকর্মী সুনীল সেনগুপ্তকে। ছোট্ট একটি বাক্য: একটু লুচি মাংস খাওয়াতে পারেন?

দীনেশ জানতে পেরেছিলেন সুনীলবাবু এই জেলেরই এক নম্বর ওয়ার্ডে রয়েছেন। এ কথা তিনি জানতে পেরেছিলেন সেদিন যেদিন সুভাষচন্দ্রের সহায়তায় তিনি কন্‌ডেম্‌ড সেল হ'তে কিছুক্ষণের জন্য বাইরে আসার সুযোগ পেলেন।

সরস্বতী পূজা।

আইন অমান্য যারা করেছেন তাদের সংখ্যা আলিপুর জেলে নেহাৎ কম নয়।

নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে রয়েছেন সুভাষচন্দ্র বসু, হেমচন্দ্র ঘোষ, হরিকুমার চক্রবর্তী, বিপিন গাঙ্গুলী, পূর্ণ দাস, নিশি গাঙ্গুলী, জীবনলাল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখেরা।

আলিপুর জেলের সুপারিন্টেনডেন্ট তখন মিঃ সোয়ান। তিনি আইরিশ। বিপ্লবীদের প্রতি তাঁর গভীর মমতা মেশানো শ্রদ্ধা

রয়েছে। তিনি জানেন, পরাধীন জাতির শৃঙ্খল ভঙ্গের প্রস্তুতি চালান এই বিপ্লবীরাই।

দেখেছেন আইরিশ বিপ্লবীদের, দেখেছেন ভারতীয় বিপ্লবীদের। এ দুই বিপ্লবীর মধ্যে কোন ভেদরেখা টানতে পারেন নি জেল সুপার মিঃ সোয়ান। বরং তার মনে হয়েছিল, ওরা সগোত্র। বিপ্লবীর যে কোন জাত নেই।

সুভাষ বসু দাবী তুললেন। তিনি সরস্বতী পূজা করবেন। আর এ পূজায় সকলকে যোগ দেওয়ার সুযোগ দিতে হ'বে মায় কনডেমড সেলের আসামীদেরও।

মিঃ সোয়ান বিচলিত।

এ কোন্ দাবী তুললেন বিশ্বের মহান বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র ?

মিঃ সোয়ান জানালেন, যা ভাল মনে হয় করুন। কিন্তু আমার চাকরিটা যেন না যায় সেটা দেখবেন।

কনডেমড সেলের বন্দী রামকৃষ্ণ আর দীনেশকে নিয়ে সুভাষ বসু যখন পূজা প্যাণ্ডেলের দিকে যাচ্ছিলেন তখন হঠাৎ দীনেশকে এক নম্বর ওয়ার্ডে ঢুকিয়ে দিলেন তিনি।

কনডেমড সেল থেকে বাইরে আসতে পারার মুক্তির আনন্দে তখন বিহ্বল দীনেশ। এখানেই দেখা হল সহকর্মী সুনীল সেনগুপ্তের সঙ্গে।

আনন্দে আবেগে দীনেশ সহকর্মীকে জড়িয়ে ধরলেন।

বড়দাকে জানাবেন, আমি আমার আদর্শচ্যুত হই নি আর হবও না কোনো দিন।

দীনেশ লুচি মাংস খেতে চেয়েছেন সুনীলবাবুর কাছে।

কিন্তু তিনিও যে ধৃত বন্দী মাত্র। তাঁরই বা স্বাধীনতা

কোথায়? ইচ্ছে তো অনেক কিছুই করে তবে উপায় কোথায়? সাধ তো অনেক কিছুই হয় কিন্তু সাধ্যে কুলোয় না যে।

বিপ্লবীর কঠোর জীবনেও কিন্তু সেদিন ভেঙে পড়েছিলেন সুনীল সেন গুপ্ত। দীনেশের চিঠিটা পড়তে পড়তে ভাবাবেগে অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল সুনীলবাবুর চোখ দুটি।

মৃত্যু সম্পর্কে দীনেশ আজ উদাসীন বলেই তো লুচি মাংস খাওয়ার কথা এত সহজে জানাতে পেরেছেন।

নিজের অক্ষমতায় সুনীলবাবু যখন মনে প্রাণে বিধ্বস্ত ঠিক তখনই এগিয়ে এসেছিল বিশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত খুনী আসামী মতি।

কি হয়েছে স্বদেশীবাবু?

প্রথমটা সংকোচ। খানিকটা বা ভয় ভয় ভাব। তারপর মতির চোখের তারায় তারায় সুনীলবাবু পড়তে সক্ষম হয়েছিলেন বিশ্বাসের ইঙ্গিত। খুলে বলেছিলেন তাকে সব কথাই—অকপটে। বন্দী জীবনে এমন বন্ধু আর নেই।

মতিও খানিকটা বিমূঢ়। তবু এ ভাবটা কাটিয়া উঠল। তার মুখের অসহায় ভাবটা ধীরে ধীরে কেটে যাচ্ছে।

লুচির ভারটা আমি নিলাম স্বদেশীবাবু।

অবাক সুনীলবাবু।

লুচি কোথায় পাবে তুমি?

সে সম্পর্কে আপনি আর ভাববেন না বাবু। ওটার দায়িত্ব আমার উপরেই ছেড়ে দিন। কিন্তু মাংস তো জোগাড় করে উঠতে পারব না বাবু।

লুচির জন্য আর ভাবনা নেই সুনীলবাবুর। মতি তার কথা রাখবেই যখন কথা দিয়েছে সে। কিন্তু মাংসের কী ব্যবস্থা করবেন? অথচ ব্যবস্থা তাঁকে যা হোক একটা করতেই হবে।

দীনেশ খেতে চেয়েছেন। না খাওয়াতে পারলে সারা জীবন সেই দুঃখের বোঝাটা তাকে টেনে বেড়াতে হবে।

বিকেলে যখন বন্দীদের ওয়ার্ডের বাইরে আসার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল তখনই সুনীলবাবুর চোখে পড়েছিল জেলেরই একপাল পোষা মুরগী। একটা সরিয়ে নিতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু পারেন নি। সেই সময়েই তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডে বন্দী ব্যানার্জীবাবুর সঙ্গে।

সুনীলবাবুকে তিনি চেপে ধরেছিলেন।

ভয় নেই আপনার, খুলে বলুন সব কিছু আমার কাছে। আমি আপনার কোন ক্ষতি কোরব না এইটুকু কথা দিচ্ছি।

সুনীলবাবু ব্যানার্জীর চোখের উপরে চোখ রেখেছিলেন। তারপর ধীরে ধীরে বলেছিলেন দীনেশের ইচ্ছের কথা। মৃত্যু পথ যাত্রী দীনেশের অন্তিম ইচ্ছার কথা বলতে গিয়ে সুনীলবাবুর গলাটা কেমন ধরে এসেছিল।

ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডে বন্দী আসামীদের সঙ্গে এই স্বদেশী বাবুদের একেবারে আদা কাঁচকলা। অথচ কী আশ্চর্য! ব্যানার্জী বাবু সাহায্য করতে রাজী হলেন সুনীলবাবুকে।

আমি কথা দিচ্ছি, যে করেই হোক খানিকটা মাংস আপনাদের ওয়ার্ডে পাঠিয়ে দেবই।

কথা রেখেছিলেন ব্যানার্জীবাবু।

কথা রেখেছিল মতি।

আর সুনীলবাবু দীনেশের অন্তিম ইচ্ছাটুকু পূরণ করতে পারলেন বলে পরিতৃপ্ত।

সেদিন বোধ হয় আরও দুজন পরিতৃপ্তি পেয়েছিলেন একজন ব্যানার্জীবাবু আর অপরজন খুনী আসামী মতি।

স্তব্ধ হয় নি পৃথিবীর গতি।

অনন্ত কাল প্রবাহ অবলম্বনে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপী যে গতি স্রোত তার আবর্তমুখে কতো শত সৌর জগৎ কতো শত সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্র একবার জ্বলে উঠেছে আবার মিলিয়ে গিয়েছে। সীমাহীন মহাব্যোমে কতো শত জ্যোতিপুঞ্জের একবার উদায় হচ্ছে আবার তা লয়ও পাচ্ছে। জগতের বুকে কতো শত দেশ, কতো রাজ্য, রাজধানী, জাতি, শিক্ষা, সভ্যতা, সংস্কৃতির উদ্ভব হচ্ছে আবার অন্তর্ধানও ঘটছে। সৃষ্টি ও ধ্বংসের এই অবিরাম প্রবাহ অবিরত ছুটে চলেছে।

কাল যে নিরন্তর প্রবহমান।

তাই কাল প্রবাহ স্রোতে ভেসে এসেছিল ৬ই জুলাই।

আগামী কাল ভোরে দীনেশের ফাঁসি।

ফাঁসির প্রস্তুতি পর্ব শেষ।

দীনেশ কিন্তু নিশ্চিন্ত নির্বিকার। মৃত্যুকে ভয় পান না তিনি।

তিনি জানেন, তাঁর জীবন চলে যাবে। মৃত্যুতে তাঁর এ জীবনের সব সুখ দুঃখ, আকাশ ভরা আলো পৃথিবী ভরা শ্যামলিমা সব পড়ে থাকবে। তাঁর বুকে হয়তো বা বেদনা ও অনিশ্চিতের দোলা। এ স্বাভাবিক কিন্তু তিনি যে জীবনের স্বরূপ বুঝেছেন। তিনি তো বিশ্বাস করেন জীবন অনন্ত পথের নিরুদ্দিষ্ট যাত্রী।

কাল স্রোতে ভেসে যায় যৌবন ধনমান।

সৃষ্টির মধ্য দিয়ে যে বিরাট অজানা প্রবল গতিস্রোতে আত্ম প্রকাশ করতে করতে চলেছে মানব জীবনও তারই সাথে যুক্ত হয়ে গতিস্রোতে ভেসে যাচ্ছে। মানব জীবনের মধ্যেই তো অসীম অজানার লীলা—গতিস্রোতেরই পটভূমিকায়। কবে এ যাত্রার আরম্ভ আর কবে শেষ কে বলতে পারে? জন্ম-জন্মের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না,

নিরাসক্ত পথিক-জীবন চলে আজানা পথে সুদূরের উদ্দেশ্যে। এই চলাটাই তার কাছে একমাত্র সত্য, পরম সত্য।

এই দেহটির ভেলা নিয়ে দিয়েছি সাঁতার গো,
এই দুদিনের নদী হব পার গো।
তার পরে যেই ফুরিয়ে যাবে বেলা,
ভাসিয়ে দেব ভেলা।
তার পরে তার খবর কী যে ধারিনে তার ধার গো,
তার পরে সে কেমন আলো, কেমন অন্ধকার গো

কন্‌ডেম্‌ড সেলের অভ্যন্তরে বসে থাকতে থাকতে দীনেশের মনে হয়েছিল আমি চির পথিক। অপলক-দৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সংসারের সুখ-দুঃখ, ভয়-সংশয়, স্নেহ-প্রেম মূল্য হীন হয়ে গিয়েছিল তাঁর কাছে—

ভাবনা নিয়ে মরিস কেন ক্ষেপে ?
দুঃখ সুখের লীলা
ভাবিস একি রৈবে বক্ষে চেপে
জগদ্দলন—শিলা ?

চলেছিস যে চলাচলের পথে
কোন্ সারথির উধাও মনোরথে ?
নিমেষ তরে যুগে যুগান্তরে
দিবে না রাশ ঢিলা।

... ...

চলতে যাদের হবে চিরকালই
নাইকো তাদের ভার
কোথায় তাদের রইবে থলি থালি,
কোথা বা সংসার ?

দেহযাত্রা মেঘের খেয়া বাওয়া
মন তাদের ঘূর্ণ্য-পাকের হাওয়া ;
বেঁকে বেঁকে আকার এঁকে এঁকে
চলেছে নিরাকার্।
ওরে পথিক, ধরনা চলার গান,
বাজারে একতারা।
এই খুশিতেই মেতে উঠুক প্রাণ-
নাইকো কূল-কিনারা।

তাই মৃত্যু ভয় দীনেশের ছিল না।

ম্যানিলা রজ্জুতে যখন মোম লাগানো হচ্ছে, যখন সমান ওজনের বালির বস্তা ঝুলিয়ে রজ্জুর দৃঢ়তা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়ার প্রচেষ্টা চলেছে—তখন সব কিছুই দীনেশের খেলা বলে মনে হয়েছিল। উদ্যোগ-আয়োজন পর্ব দীনেশের মনে কোন দাগ কাটে নি।

সময়ের অনেক গুলো গাঁট পার হয়ে এসেছিল ধূসর গোধূলি। সোনালী সকাল আর ঘুঘু ডাকা নিঃস্তব্ধ দুপুর শেষে বিকেল।

মনে পড়েছিল তাঁর মা, দাদা, বৌদি সকলের কথা।

বৌদিকে একদিন তিনি লিখেছিলেন,

"...তোমার মনে থাকিতে পারে, তোমার চুল দিয়া আমি পুতুল নাচাইতাম। পুতুল আসিয়া গান গাইত—'কেন ডাকাইছ আমায় মোহন ঢুলি?' যে পুতুলের পার্ট শেষ হইয়া গেল, আর তাহাকে ষ্টেজে আসিতে হইত না। ভগবানও আমাদের নিয়া পুতুল নাচ নাচাইতেছেন। আমরা এক একজন পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে পার্ট করিতে আসিয়াছি। পার্ট করা শেষ হইলে প্রয়োজন ফুরাইয়া যাইবে। তিনি রঙ্গমঞ্চ হইতে আমাদের সরাইয়া লইয়া যাইবেন। ইহাতে করিবার কি আছে?"

দীনেশ আফসোস করেন নি কোনদিনই। তা ছাড়া সংসারে থেকেও তিনি সংসারের মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন নি। তাই অনায়াসে তিনি মাকে লিখতে পেরেছিলেন,

"কেবা কার? সমস্তই মায়া! তাঁকে কায়-মনোবাক্যে ডাক, তিনি মায়ার জাল ছিন্ন করিয়া তোমাকে শান্তি দিবেন। সংসারের পাঁকে পুত্র-কলত্র লইয়া যতই জড়াইয়া থাকিতে চেষ্টা করিবে, ততই অশান্তি। সংসারে থাকিয়া অনেক দুঃখ পাইয়াছ, এখন সব ছাড়িয়া শান্তিময়কে পাইবে।

শান্তিময়কে ডাকিতে চেষ্টা কর। মনে করিও তোমার এক পুত্রের পরিবর্তে ভারতে সমস্ত ছেলেকে তুমি পুত্র রূপে পাইয়াছ। তুমি তাদের সকলের মা। তুমি তাদের সকলকে তোমার নন্তু'র মত ভালবাস।

আপন হৃদয়কে যদি বিস্তার করিতে পার, তবে শান্তি পাইবে। ভালবাস দুঃখী, কাঙাল, অনাথ, আতুরকেঁ। আপন সন্তানের মত ভালবাসা। ক্ষুদ্র সংসারের গণ্ডির বাইরে ভালবাসা বিলাইয়া দাও, অপার আনন্দ পাইবে।"

বিকেল গড়িয়ে গড়িয়ে শোনা গিয়েছিল বেলা শেষের গান।

এক তাড়া কাগজ টেনে নিয়ে চিঠি লিখতে বসেছিলেন দীনেশ।

আর কতক্ষণ সময়ই বা হাতে আছে?

আলিপুর সেন্ট্রাল জেল, ৫ ॥ (সন্ধ্যা)
৬. ৭ ৩১. কলিকাতা ।

স্নেহের ভাইটি,

তুমি আমাকে চিঠি লিখিতে বলিয়াছ, কিন্তু লিখিবার সুযোগ করিয়া উঠিতে জীবন সন্ধ্যা হইয়া আসিল।

যাবার বেলায় তোমাকে আর কি বলিব? শুধু এইটুকু বলিয়া তোমাকে আশীর্বাদ করিতেছি, তুমি নিঃস্বার্থপর হও, পরের দুঃখে তোমার হৃদয়ে করুণার মন্দাকিনী ধারা প্রবাহিত হউক।

আমি নিজে তোমাদের ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছি বলিয়া দুঃখ করিও না ভাই। যুগ যুগ ধরিয়া এই যাওয়া আসাই বিশ্বকে সজীব রাখিয়াছে, তার বুকের প্রাণ সম্পদকে থামিতে দেয় নাই। আর কিছু লিখিবার নাই। আমার অশেষ ভালবাসা ও আশীষ জানিবে।

—তোমার দাদা।

আলিপুর সেন্ট্রাল জেল, ৫ ॥ (সন্ধ্যা)
৬. ৭. ৩১. কলিকাতা।

মা,

তোমার সঙ্গে আর দেখা হবে না। কিন্তু পরলোকে আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করিব। তোমার কিছুই কোনদিন করিতে পারি নাই। সে না করা যে আমাকে কতখানি দুঃখ দিতেছে তাহা কেহই বুঝিবে না, বুঝাইতে চাইও না।

আমার যত দোষ, যত অপরাধ, দয়া করিয়া ক্ষমা করিও। আমার ভালবাসা ও প্রণাম জানিবে।

—তোমার নন্টু

ছয়ই জুলাই

থমথমে রাত্রি প্রহরে প্রহরে এগিয়ে চলেছে গভীরে।

জেগে রয়েছে আলিপুর সেন্ট্রাল জেল।

সব ওয়ার্ডের রাজনৈতিক বন্দীরা ভাবছেন।

কাল ভোরে দীনেশকে এ পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে। স্বাধীনতার মূল্যায়ণ হবে তাঁর মৃত্যুতে। কোন ডাকই তো আর তাঁর কানে পৌঁছাবে না।

দীনেশ ওদের সহকর্মী। অগ্নিযুগের ইতিহাসে যুগান্তর সৃষ্টিকারী দীনেশ আজ সাম্রাজ্যবাদী ব্রটিশ শাসকের প্রতিহিংসার বলি। কবি, শিল্পী, লেখক, দার্শনিক সর্বোপরি দেশ প্রেমিক দীনেশকে গুণতে হচ্ছে জীবনের শেষ প্রহর। আরও কত শত প্রাণ দিতে হবে বলিদান কে বলতে পারে?

দীনেশ ঘুমিয়ে আছেন।

মুখে তার নিরুদ্বেগ জীবনের প্রশান্তি।

হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যায় দীনেশের।

মৃত্যুদূতের পদধ্বনি শুনতে পেয়েছেন তিনি।

সমাগত লগ্ন। এবার উঠে পড়তে হয়। যেতে হবে তাঁকে অনেক দূরে।

সুপ্রভাত সার্জেন্ট। একটা চিঠির জবাব লেখার সময় চাই।

ব্রিটিশ সার্জেন্টকে শুভেচ্ছা জানালেন দীনেশ। তারপর লিখতে বসলেন জীবনের শেষ চিঠি খানা। ওটা শেষ তাকে করতেই হবে।

আলিপুর সেন্ট্রাল জেল কলিকাতা

৭. ৭. ৩১. (প্রত্যুষে)

বৌদি,

এই মাত্র তোমার চিঠিখানা পাইলাম। আমার জীবন কাহিনী জানাইবার সুযোগ হইল না। কি-ই বা জানাইব

বল তো? আমার কথাই তো তোমাদের বুকে চিরকাল আঁকা থাকিবে। তুচ্ছ কালির আঁচড় কি তাহাকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে পারিবে? আমার যত অপরাধ ক্ষমা করিবে। এ জন্মের মত বিদায়। ভালবাসা ও প্রণাম জানিবে।

ইতি—

—তোমার ঠাকুর পো।

শেষ চিঠিখানা তুলে দিয়েছিলেন সার্জেন্টের হাতে।

এই চিঠিখানা তুমি অফিসে জমা দিয়ে দিও। তারপর দৃঢ় বলিষ্ঠ কণ্ঠে দীনেশ বলেছিলেন, আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

পাশের সেল হ'তে রাম কৃষ্ণ তাকিয়ে ছিলেন দীনেশের দিকে। তাকে বিদায় জানিয়ে দৃঢ় পদে এগিয়ে চললেন তিনি।

ফাঁসির আসামীকে স্নান করানো একটা প্রচলিত রীতি। দীনেশ নিজেই স্নান শুরু করলেন, কারও সাহায্য তিনি নিলেন না।

ওঁ জবা কুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।

ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতো ঽস্মি দিবাকরম্॥

সূর্য্য প্রণামের মন্ত্র-সুধা ঝরে পড়েছে দীনেশের কণ্ঠ হতে।

আশ্চর্য হ'লেন শ্বেতাঙ্গ সার্জেন্টটি।

আশ্চর্য্য না হয়েই বা উপায় কি?

কনডেমড সেলে থেকেও দীনেশের দেহের ওজন বেড়েছে বই কমে নি, কত নিশ্চিন্ততা থাকলে তা সম্ভব সে কথা ভেবেই আশ্চর্য হয়েছিলেন সার্জেন্টটি।

মরণকে তোমার ভয় করে না?

প্রশ্ন শুনে হেসে উঠেছিলেন দীনেশ। তাঁর কানে তখন বাজছে, মরণেরে তুঁহু মম শ্যাম সমান।

ভয় করবে কেন? গীতায় কি আছে জান?

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নারোঽপরানি।
তথা শরীরানি বিহায় জীর্ণা
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥

এ দেহ ছেড়ে আবার হয়তো নূতন দেহ নিয়ে আসব। আবার হয়তো তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে।

উনিশ শ' একত্রিশের সাতই জুলাই।

ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান গাইতেই যেন ক্ষোভশূন্য, শঙ্কাশূন্য, ভয়শূন্য দীনেশ উঠে দাঁড়ালেন মঞ্চের উপর। তাঁর কাছে এ তো ফাঁসির মঞ্চ নয়, এ যে তীর্থভূমি, শহীদের পাদস্পর্শে এ মঞ্চ যে পুণ্যস্থান।

তুমি কি বলতে চাও?

আমাদের বলার অধিকার কেড়ে নিয়ে মিথ্যে সৌজন্যতা বজায় রাখার চেষ্টা কেন?

ফুঁসে উঠেছিল দীনেশ।

আমি প্রস্তুত। তুমি তোমার কর্তব্য পালন কর, সার্জেন্ট।

বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে হাসিমুখে দীনেশ উচ্চারণ করেছিলেন, বন্দে মাতরম্।

মরণ-মালা গলায় পরে মরণ জয়ী দীনেশের জীবনের জয়োল্লাসে চলে গেলেন!

শহীদ বিনয়-বাদল-দীনেশ রচনা করলেন অগ্নিযুগের ইতিহাসের নতুন অধ্যায়।

বিনয়-বাদল-দীনেশ—জিন্দাবাদ্।

বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার অশ্রুধারা
এর যত মূল্য সে কী ধরার ধূলায় হবে হারা?